মুজফ্‌ফর আহমদের দৃষ্টিতে নজরুল

নজরুলের বন্ধুদের মধ্যে শৈলজানন্দের পর মুজফ্‌ফর আহমদের নামটি সকলের নিকট বিশেষ পরিচিত। কাজী নজরুল ইসলাম 'স্মৃতিকথা' এই নামে তাঁর গ্রন্থটি নজরুল বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। সৈনিক জীবনের শেষে নজরুল শৈলজানন্দের নিকট থেকে তাঁর কাছে চলে আসেন এবং দীর্ঘকাল তিনি তাঁর কাছেই থেকেছেন। বয়সে মুজফ্‌ফর আহমদ বড় হলেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং 'তুমি' সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে নজরুল সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন যা নজরুলকে যথাযথভাবে জানার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ কারণে গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করছি।

মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) রাজনৈতিক জীবনে কমিউনিষ্ট মতাবলম্বী ছিলেন। তাই তাকে 'কমরেড' বলা হতো। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। সেই সুবাদে তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' ও 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সঙ্গে সম্পৃক্ত হন।

'স্মৃতিকথা' মূলক তাঁর এই গ্রন্থটিতে নজরুল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এই গ্রন্থে মুজফ্‌ফর আহমদ নজরুল সম্বন্ধে অনেক ভুল তথ্য সংশোধন করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে মুজফফর আহমেদ 'কমরেড' হলেও মুসলমান জাতির প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল। কিন্তু তিনি অন্য ধর্মের প্রতি কখনও বিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার এবং অসাম্প্রদায়িক।

নজরুলের জীবনে তাঁর দারুণ প্রভাব ছিল। এই গ্রন্থে মুজফ্‌ফর আহমদ নজরুলের কাব্যপ্রতিভা, ভাষা ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা রেখেছেন। সৈনিক থাকা অবস্থায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় ১৯১৯ সালে নজরুল একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন এবং তা 'মুক্তি' নামে প্রকাশিত হয়। 'মুক্তি' কবিতাটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা হয়েছিল। কবিতাটি মুজফ্‌ফর আহমদকে মুগ্ধ করে এবং তিনি তাঁর রচনার মধ্যে একজন যথার্থ কবির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন এবং কালে মুজফ্‌ফর আহমদের এই বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয়েছিল। কবিতার পাশাপাশি সেই উন্মেষলগ্নে নজরুলের গল্প ও উপন্যাস 'হেনা' ও 'ব্যথারদান' সম্পর্কেও তাঁর বড় মাপের সাহিত্যিক হবার সম্ভাবনার বিষয়টিও এসেছিল।

নজরুলের কাব্যে রুশ বিপ্লবের প্রভাব

মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে নজরুল শিয়ারশোল রাজা হাইস্কুলে পাঠরত অবস্থায় সেই স্কুলের শিক্ষক বিপ্লবী শ্রী নিবারণ চন্দ্র ঘটকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তখনই তাঁর চেতনায় বিপ্লবী ভাবনারও উন্মেষ ঘটে। নজরুল বন্ধু শৈলজানন্দ অবশ্য এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থে কোন আলোকপাত করেননি। মুজফ্‌ফর আহমদের সান্নিধ্যে থেকে নজরুল পুরোপুরিই বিপ্লবী হয়ে উঠেছিলেন। নজরুল কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় কোন উল্লেখ করেননি। নজরুলের কোন লেখায়ও তা নেই। এ থেকে অনুমিত হয় যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না।

নজরুল তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরুতে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ–এই দুইজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কাছে তিনি বিপ্লবের দীক্ষা নেন এবং মুজফ্‌ফর আহমদের নিকট থেকেই তার সাম্যবাদী ভাবনা বিশেষ করে কৃষক, মজুরশ্রেণির প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ গড়ে ওঠে। অবশ্য এ সবের অনেক আগে থেকেই বলা চলে, তাঁর সৈনিক জীবনের সময় তিনি রুশ বিপ্লব এবং লাল ফৌজদের বিষয় অবহিত হন এবং তার সহমর্মিতা অন্তরে দানা বাঁধে। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে রাশিয়ার আক্টোবর বিপ্লব' যা পরে কারো কারো কাছে 'নভেম্বর বিপ্লব' হয়েছিল' এবং লাল ফৌজ সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নজরুল যে প্রত্যক্ষভাবে রুশবিপ্লব ও লাল ফৌজকে সমর্থন করতেন, সে সর্ম্পকে তিনি স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। নজরুলের 'ব্যথার দান' উপন্যাসে রুশবিপ্লব ও লাল ফৌজের প্রতি নজরুলের যে দারুণ আকর্ষণ জান্মেছিল তা বেশ ভালভাবে বুঝা যায়।

নজরুল মানসিকভাবেই রুশবিপ্লবের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। রুশবিপ্লব এবং লাল ফৌজ সম্পর্কে সব পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি নজরুল সে সময় অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে সংগ্রহ করেছিলেন। কারণ এ বিষয়ে বৃটিশ কর্তপক্ষের ভারতীয় বাহিনীর প্রতি কড়া নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল।

নজরুলের সৈনিক জীবনে জমাদার শম্ভু রায় তার সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে। রুশবিপ্লব এবং লাল ফৌজদের মাঝে নজরুলের সম্পর্কের বিষয় জমিদার শম্ভু রায় নজরুলের প্রীতিভাজন বন্ধু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে ১৯৫৭ সালে ৬ জুন একটি চিঠি লিখেছিলেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ নিজে সে পত্র পড়েছিলেন। এ বিষয়ে তার গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। জমাদার শম্ভু রায়ের এই পত্রের কিয়দংশ মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নিবে তার বিবরণ দেওয়া হলো।

"নজরুল তার বন্ধুদের মধ্যে যাদের বিশ্বাস করত তাদের এক সন্ধ্যায় খাবার নিমন্ত্রণ করেন। অবশ্য এ রকম নিমন্ত্রণ প্রায়ই সে তার বন্ধুদের করত। কিন্ত ঐ দিন

যখন সন্ধ্যার পর তার ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু তার অরগ্যান মাষ্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখেমুখে একটা অন্য রকমের জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। উক্ত নিত্যানন্দ দে মহাশয়ের বাড়ী ছিল হুগলী শহরের ঘুটিয়া বাজার নামক পল্লীতে। তিনি অরগ্যানে একই মার্চিং গৎ বাজানোর পর নজরুল সেই দিন যে-সব গান গাইল ও প্রবন্ধ পড়ল তা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান বাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশবিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লাল ফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং ঠিক নাম মনে নেই সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়। ঐ পত্রিকাতে আমরাও বিশদভাবে সংবাদটি দেখে উল্লসিত হয়ে উঠি। সে দিন সারা রাতই প্রায় হৈ হুল্লোড়ে আমাদের কেটে গিয়েছিল।" (মুজফ্‌ফর আহমদ 'স্মৃতিকথা' পৃ. ১০৬)।

উপরিউক্ত পত্রাংশ পাঠ করে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে তিনি সৈনিক জীবনেই রুশবিপ্লব কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন। অক্টোবর বিপ্লব তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তিনি ভারতীয় হয়েও আন্তর্জাতিক মতবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। নজরুল মূর্তজা আলী নামে একজন ভারতীয় কমিউনিষ্ট সৈনিককে আদর্শ বলে ভেবেছিলেন। মূর্তজা আলী লাল ফৌজে যোগদান করে অসাধারণ সাহসিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি নিকোলাই গিকালো পরিচালিত সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গিকালোর বোন ভেরা ফিয়োদ্রবনা নিজেও একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর একটি লেখায় তিনি মূর্তজা আলীর কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, "আমি যখন আজকাল সোবিয়েত দেশ ও ভারতের দুই মহান জনগণের ভ্রাত্রীয় বন্ধনের কথা পড়ি তখন আমার মনে পড়ে সেই সকল সাহসী অথচ বিনয়ী আন্তর্জাতিকতবাদী যোদ্ধাদের কথা। হতে পারে সংখ্যায় তারা কম ছিলেন, কিন্তু বীর যোদ্ধা মূর্তজা আলীর মতো তাঁরাও জনগণের মুক্তির জন্যে প্রাণ দিতে একটুকুও কুণ্ঠিত হননি। আমাদের বন্ধুত্ব যুদ্ধের ময়দানে ঝরা রক্তের মোহর মারা। জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব চিরজীবি হবে।"

('In common they fought তাঁরা একসঙ্গে লড়েছিলেন। প্রকাশকাল ১৯৫৭। প্রকাশক Foreign Languages Publishing House, Moscow দ্র. মুজফ্‌ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা ২০০৯, কলকাতা পৃ ১০৭')

প্রসঙ্গতঃ মুজফ্‌ফর আহমদের কথা বলা চলে। তিনি নিজে একজন কমিউনিষ্ট ছিলেন। তাঁর কাছে ইসলাম ধর্ম, মুসলিম জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি গুরুত্ব পাবার কথা নয়। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চায় মুসলিম মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত দিলেন এবং নজরুলকে একজন বড় কবি হিসেবে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁর সময়ে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি এবং নোবেল বিজয়ী।

মুসলমানদের মধ্যে প্রতিভাধর হিসেবে তখন কেউ ছিল না। নজরুলের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী প্রতিভার উন্মেষ লক্ষ্য করে তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন এবং তা তাঁর মুসলমান হওয়ার কারণেই যে হয়েছিল এমনটি অস্বীকার করা যায় না।

বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের উজ্জীবনী শক্তি হিসেবে নজরুলকেই মানসিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল, একথা সত্য। কিন্তু নজরুল নিজে হিন্দু-মুসলমান এমন সাম্প্রদায়িক চিন্তা কখনও গ্রহণ করেননি। তবে তার সাহিত্য-চর্চার শুরুতে মুসলমানেরাই এগিয়ে এসেছিলেন। প্রথম দিকে যে সমস্ত সাহিত্য পত্রিকায় নজরুলের কবিতা স্থান পেয়েছে, তার সবকটি মুসলমান পরিচালিত ও সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা। ইতোমধ্যে মুজফ্ফর আহমদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার নজরুলের কবিতা, গল্প ইত্যাদি যে সব সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তার মধ্যে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'মোসলেম ভারত', 'সওগাত', 'নওরোজ', 'সোলতান' অন্যতম।

নজরুল ইসলাম লালফৌজদের দ্বারা এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়কেরা প্রায় সকলেই লালফৌজের বীর সৈনিক হয়ে উঠেছিল। নজরুলের জীবনে ও কর্মে লালফৌজ এবং লাল নিশানা যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা তাঁর কাব্য, উপন্যাস ও ছোট গল্প পাঠ করলেই বুঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নজরুলের কাব্যে সাম্যবাদ এবং মানবতার যে উদ্বোধন ঘটেছিল তাঁর মূলে ইসলামের প্রভাব কম নয়। নজরুল ইসলাম আরবী ও ফার্সি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। যুদ্ধে থাকাকালীন সময়ে তাঁর এই জ্ঞানলাভ হয়েছিল। এসময় তিনি একজন শিক্ষকের কাছে ফার্সিভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। দিওয়ান হাফিজ, ওমর খৈয়ামসহ আরও অনেক ফার্সি কবির কাব্যের সঙ্গে সৈনিক থাকাকালীন সময়ে তার পরিচয় হয়। অসাধারণ মেধাবী ছিলেন বলে অল্প সময়েই তিনি ফার্সি ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

নজরুল ও সমকালীন সমাজ

সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তাতে মুসলমান কবি সাহিত্যিক তথা মুসলমান জাতি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষে হিন্দুরা অগ্রগামী ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদকেও তাঁরা লালন করতেন। সে সময় মুসলমানেরা হিন্দুদের নিকট 'অস্পৃশ্য' 'ম্লেচ্ছ' এবং 'যবন' নামে পরিচিত ছিল। সে সময় মহামেডান স্পোটিং ক্লাব যেমন মুসলমানদের প্রেরণার উৎস ছিল তেমনি ছিলেন কবি নজরুল। নজরুলের মতো বড় কবি সে সময় মুসলমানদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের দুর্ব্যবহার এবং হেয়-জ্ঞান সে সময় মুসলমানদেরকে পীড়িত করেছিল। এ কারণেই তারা ভারতীয় হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে চায়নি।

নবযুগ, 'ধূমকেতু' নজরুলের নিজস্ব সম্পাদিত পত্রিকা। নজরুল যখন বেশ প্রতিষ্ঠিত কবি তখন তাঁর লেখা 'প্রবাসী' কল্লোল ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে প্রথম দিকে তাঁর সম্পর্ক তেমন ভাল ছিল সে-সময়ে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীতে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। মোহিতলাল 'প্রবাসী'তে তাঁর লেখা ছাপা হোক তা চাইতেন না। 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর প্রচণ্ড দুঃখ কষ্টের সময় "দারিদ্র" কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কবিতাটিকে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের আবশ্যিক পাঠ্যে স্থান দিয়েছিল। (মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চর্তুদশ মুদ্রণ ২০০৯, পৃঃ ৯৭) নজরুলের গান ও কবিতা 'সাপ্তাহিক গণবাণী' 'ফণিমনসা'তে ছাপা হয়েছিল। মাওলানা আকরাম খান প্রতিষ্ঠিত 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় তাঁর কোন লেখা ছাপা হয়েছিল কি না তা আমার জানা নেই। তবে, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পূজা সংখ্যার জন্য নজরুলকে আগমনী নামে একটি কবিতা লিখতে বল্লে নজরুল 'আনন্দময়ীর আগমনে' এই নামে যে কবিতা লিখলেন আনন্দবাজার পত্রিকায় তা ছাপা হয়নি। কবিতাটি পরে 'ধূমকেতু'র একটি সংখ্যায় ছাপা হয়। পরে সরকার কবিতাটি বাজেয়াপ্ত করে। যা হোক, এ কথা সত্য যে নজরুলের সাহিত্যচর্চার প্রথম দিকে মুসলমানদের পরিচালিত এবং সম্পাদিত পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা ছাপা হয়েছে। বলা যেতে পারে, তাঁর কবি স্বীকৃতি মূলেও প্রাথমিক স্তরে স্বধর্মীদের অবদান ছিল।

নজরুল আজীবন অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তিনি হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করেন এবং হিন্দু ধর্মভিত্তিক নানা কবিতা, সঙ্গীত লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি অধিকাংশ হিন্দুদের মন জয় করতে পারেন নি। অনেকে তার স্পর্শে থেকেও দূরে থাকতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে থাকা খাওয়াও করতে চায়নি। মুসলমনাদের মধ্যেও এমন অবস্থা ছিল। তাঁরা তাঁকে 'কাফের', 'ইসলামের শত্রু', 'শয়তান' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁরা ব্যঙ্গাত্মক কবিতাও লিখেছেন।

এ সময় মুসলমান কবি সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। মাওলানা আকরাম খাঁ'র নেতৃত্বে একদল রক্ষণশীল মুসলমান নজরুল ও তাঁর কবিতাকে অন্যায়ভাবে বিদ্বেষমূলক উক্তি, এমনকি গালাগাল পর্যন্ত করেছেন। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় তা ছাপাও হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, মাওলানা আকরাম খাঁ নজরুল সম্বন্ধে কটুক্তি করতে পারেন। নজরুল আজীবন ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর নানা কবিতায় ইসলামের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর সাম্যবাদী চেতনাও ইসলামের বিশ্বাসে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। বরং বলা যেতে পারে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামই সমগ্র পৃথিবীতে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছে জাকাত ইত্যাদির মাধ্যমে। তথাপি নজরুলকে মুসলমানদের কাছ থেকেই নানা বিদ্রুপ ও কটুক্তি শুনতে হয়েছে। মুনসী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমেদ 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় 'লোকটা মুসলমান না শয়তান' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন:

মুসলমানের ঘরেও অনেক নাস্তিক শয়তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মুসলমান সমাজ তাহাদিগকে আস্তাকুড়ের আবর্জনার ন্যায় বর্জন করিয়াছে। সুতরাং এ যুবক কোন ছার! নরাধম ইসলাম ধর্মের মানে জানে কি? খোদাদ্রোহী নরাধম শয়তানের পূর্ণাবতার। এমন অনেকে পাপিই পৃথিবীতে জন্মিয়াছে এবং শেষটা নিকৃষ্ট জীবের মতও স্বীয় পাগলামির অবসান করিয়াছে। খাঁটি ইসলামী আমলদারী থাকিলে এই ফেরাউন নজরুলকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডুপাত করা হইত নিশ্চয়।"

অতঃপর ১৩২৯ সনের আশ্বিন সংখ্যার 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় নজরুলকে লক্ষ্য করে বলা হয়। "উহার স্বেচ্ছাচারিতা এত বাড়িয়া গিয়াছে–'রক্তাম্বর ধারিণী মা' ও 'ভূগু বন্দনা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মাভৈ, 'ব্যোম কেদার' 'ব্যোম ভোলানাথ' 'ব্যোম হরি হরি বোল' প্রভৃতি কুফরী কালাম তাহার মুখ দিয়া অনর্গল এত অধিক পরিমানে নির্গত হইতেছে যে, আমরা ভাবিয়াছিলাম যবন হরিদাসের এরূপ উৎকট অবতারকে সমালোচনা করিয়া সংযত করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু দুষ্ট ধূমকেতু ও উহার দুর্বিনীত সারথি এখন কেবল হিন্দু পুরানের চর্বিত চর্বণে ক্ষান্ত না থাকিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী শরা–শরিয়তের আজ পর্যন্ত শয়তানী আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমান চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।"

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নজরুল একশ্রেণী গোঁড়া স্বজাতি কর্তৃক অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হয়ে পড়েছিলেন। নজরুলকে তারা 'ধর্মদ্রোহী' 'দুরাচার' এবং' মুসলমান নামের' অযোগ্য এসব উক্তি প্রয়োগ করেছেন। কষ্ট লাগে যখন দেখি শিক্ষিত মুসলমান কবিরাও তাঁর বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁর কবিতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমে কাব্যজগতে নিজের আসন করে নিয়েছিলেন। সকলে অবাক বিস্ময়ে তাঁর প্রতিভার অসাধারণ বিকাশ লক্ষ্য করে অভিভূত হয়েছিল। এই কবিতার মাধ্যমে নজরুল কাব্যের জগতে এক নতুন ধারা নিজে এলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কবি গোলাম মোস্তফার মতো মানুষ নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা সমালোচনা করে 'নিয়ন্ত্রিত' নামে এক কবিতা লিখলেন ঃ-

'ওগো বিদ্রোহী বীর
সংযত কর সংহত কর উন্নত তব শীর।
বাঁধন কারার মাঝারে দাঁড়ায়ে
খালি দুটি হাত উর্ধ্বে বাড়ায়ে
তুই যদি ভাই বলিস চেঁচিয়ে- উন্নত মমশির,
আমি বিদ্রোহী বীর,"
সে শুধুই প্রলাপ, শুধুই খেয়াল, নাই নাই তার কোন গুণ,
শুনে স্তম্ভিত হ'বে 'নমরুদ' আর 'ফেরাউন'।
শুনি শিহরি উঠিবে 'শয়তান'।
হবে নাকো সেও সঙ্গের সাথী গাবে নাকো তোর জয়গান।"

সত্যি এতবড় একজন অসাধারণ কবিকে এমনভাবে অপর একজন কবি মূল্যায়িত করতে পারেন–তা ভাবাও যায় না। এরা নিজেরাও যথার্থ মুসলমান ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। ইসলাম এমনভাবে অপরজনকে আঘাত করতে নিষেধ করেছে। 'বিদ্রোহী' কবিতা না বুঝে এমন কদর্য মূল্যায়ন পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় না। এই ধরনের কবি সাহিত্যিকেরা নিজে কখনও কোন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেননি। তাঁদের লেখা মানবধর্মী ও হয়নি। আজকের পৃথিবী এই ধরনের কবিকর্মকে মনে রাখেনি। অথচ নজরুলের কবিতা আজও অমলিন।

শুধু যে গোঁড়া মুসলমানরাই নজরুলকে সমালোচনা করেছেন তা নয়। অনেক হিন্দুও বিদ্বেষ–প্রসূত হয়ে নজরুলের কবিতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এদের মধ্যে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস অন্যতম। নজরুলের কবিতা যখন দারুণ আলোড়ন এনেছে সাহিত্য জগতে এবং সকলে একবাক্যে স্বীকার করছেন যে নজরুল রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরন ও মেজাজের কবিতা এনেছেন। তিনি নতুন যুগের দিশারী। এ কথা রবীন্দ্র ভক্তদের মনে দারুণ ঈর্ষা এনে দিল। ১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাসে নব পর্যায়ের 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যায় এর সম্পাদক লিখলেনঃ

"বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জনের কাছে অপঠিত থাকিয়াই যদি রবীন্দ্রনাথের যুগ বলিয়া যায়–রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের জীবিতাস্থাতেই যদি.....নজরুল ইসলাম সাহিত্য-যুগাবতার বলে ঘোষিত হন। তাহা হইলে সমাপ্তি হউক সাহিত্যের। এই বটতলার দেশে সাহিত্য চলিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব।"

'শনিবারের চিঠি'তে সম্পাদক সজনীকান্ত দাস নজরুলকে ব্যঙ্গ করে বলতেন 'গাজী আব্বাস বিটকেল।' একটি কবিতায় তিনি নজরুল ইসলামকে সম্বোধন করে গাজী আব্বাস বিটকেল সমীপেষু' বলে লিখলেন ঃ

ওরে ভাই গাজীরে
কোথা তুই আজিরে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা!
কোথা গিয়ে নিরিবিলি
ঝোপে ঝাড়ে ডুব দিলি
তুই যেরে কাব্যগ্রন্থের সবিতা।
দাবানল বীণা আর
শহরের বাঁশীতে
শান্ত এ দেশে ঝড় একলাই তুললি,
পুষ্পকে দোলা দিয়া
মজালি দোল পিয়া
ব্যথার দানেতে কত হৃদি-দ্বার খুললি।"

এখানে নজরুলের 'অগ্নিবীণা' 'বিষের বাঁশী' এবং 'ব্যথার দান' সম্পর্কে বিদ্বেষজনিত উক্তি করা হয়েছে। তবে একথা বলতে হয়, সমালোচক নজরুলের কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে যে ব্যঙ্গ করেছেন তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি তাঁর প্রতিভার বিকাশে ভীত এবং নজরুল যে নিঃসন্দেহে একজন বড় মাপের কবি ছিলেন। তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক লেখাতে এটাও সুস্পষ্ট হয়েছে।

মোহিতলাল মজুমদার নিদারুণ অশালীনভাবে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার সমালোচনা করেছেন। এর একটি কারণ তিনি মনে করেন যে তিনি নজরুলের পূর্বে 'আমি' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে তাঁর ভাব ভাষার মিল রয়েছে বলে তিনি যে দাবী করেছেন, তা আদৌ সত্য নয়। এই গ্রন্থে দু'টি কবিতার অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়েছে।

'আমি'

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার বি,এ

আমি বিরাট। আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, নভো-নীলিমার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। চন্দ্র আমারই মৌলিশোভা, ছায়াপথ আমার ললাটিকা, অরুণিমা আমার দিগন্তসীমান্তের সিন্ধুচ্ছটা, সূর্য্য আমার তৃতীয় নয়ন এবং সন্ধ্যারাগ আমার ললাট-চন্দন।

বায়ু আমার শ্বাস, আলোক আমার হাস্য জ্যোতি। আমারই অশ্রুধারায় পৃথিবী শ্যামলীকৃত। অগ্নি আমার বুভুক্ষা-শক্তি, মৃত্তিকা আমার হৃৎপিন্ড, কাল আমার মন, জীব আমার ইন্দ্রিয়। আমি মেরুতারকার মত অচপল।

আমি ক্ষুদ্র। প্রত্যুষের শিশিরকণা আমার মুখ-মুকুর, সাগর-গর্ভের মুক্তিমুক্তা আমার অভিজ্ঞান, পতঙ্গের পক্ষপত্র আমারই নামাঙ্কিত, অশ্বত্থবীজে আমার শক্তিকণা, তৃণে আমার রসপ্রবাহ, ধুলি আমার ভস্মাঙ্গরাগ।

আমি সুন্দর। শিশুর মত আমার ওষ্ঠাধর, রমণীর মত আমার কটাক্ষ, পুরুষের মত আমার ললাট, বাল্মীকির মত আমার হৃদয়। সূর্য্যাস্তশেষ প্রায়ান্ধকারে আমি শশাঙ্কলেখা, আমি তিমিরাবগুণ্ঠিতা ধরণীর নক্ষত্রস্বপ্ন। আমার কান্তি উত্তর উষার ন্যায়।

আমি ভীষণ,– অমানিশীথের সমুদ্র, শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টি-নেপথ্যের ছিন্ন মস্তা, কালবৈশাখীর বজ্রাগ্নি, হত্যাকারীর স্বপ্নবিভীষিকা, ব্রাহ্মণের অভিশাপ, দম্ভান্ধ পিতৃরোষ। আমি ভীষণ,– রণক্ষেত্রে রক্তোৎসবের মত, আগ্নেয়গিরির ধুমাগ্নিবমনের মত, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত, কাপালিকের নরবলির মত, সদস্য-শোকের মত, অখণ্ডনীয় প্রাক্তনের মত, দুর্ভিক্ষের সচল নরকঙ্কালে আমাকে দেখিতে পাইবে, যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর ভোগলালসায় আমারই জিহ্বা লক্‌লক্ করিতেছে। আমিই মহামারী। রুধিরাক্তকৃপাণ ঘাতকের অট্টহাসিতে, মৃত-জনের শূন্যদৃষ্টি চক্ষুতারকায় আমরা পরিচয় পাইবে।

আমি মধুর – জননীর প্রথম পুত্রমুখচুম্বনের মত, তৃষিত বনভূমির উপর নববরষার পুষ্পকোমল ধারাস্পর্শের মত; দিব্যমাল্যম্বরধরা ব্রীড়াবেপথুমতী বিবাহধূমারুণ লোচনশ্রী নববধূর পাণিপীড়নের মত, যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির মত, প্রণয়িনীর সরমসঙ্কোচের মত, কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির মত। আমি ম্যাডনা– বক্ষে নিমীলিত নয়ন স্তনন্ধয় শিশু; আমি সাবিত্রী অঙ্কের মৃত পতি; আমি বিদর্ভরাজ তনয়ার প্রণয়দূত– হংস, আমি তাপসী মহাশ্বেতার নয়নসলিলর্দ্র তন্ত্রী বীণা; আমি স্বামীর সহিত সপত্নীর মিলনে স্মিতমুখী বাসবদত্তা; আমি পতিপরিত্যক্তা "ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগ"– বচনা জানকী। সান্ধ্য আকাশের মেঘস্তরে আমার বসনাঞ্চল ঘুরিয়া যায়, ঊষার আরক্ত কপোল আমার লজ্জারাগ। আমি করুণার অশ্রুজল, প্রেমের আত্মত্যাগ, স্নেহের পরাজয়। আমার নত নেত্রের কিরণ সম্পাতে রজনী জ্যোৎস্নময়ী, আমারই সুগোপন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধরণীর উপবন কুসুমিত হইয়া উঠে, আমিই সুখসপ্তের নয়ন-পল্লবে মৃণাল-বর্ত্তিকায় স্বপ্নাঞ্জন পরাইয়া দিই। আমি হৃদয়-সীমায় চুম্বনের মত জাগিয়া উঠি এবং নেত্রপ্রান্তে অশ্রুর মত ঝরিয়া যাই।

আমি আনন্দ – শরৎ প্রভাতের স্বর্ণালোক। পত্রপুষ্পে ওষধিলতায় সে আনন্দ শিহরিয়া উঠিতেছে, ক্ষুদ্র মৃত্যু, তুচ্ছশোক, অজ্ঞান-অশ্রুর উপরে আমার আনন্দ বৃহৎ অসীম অনন্ত আকার ধারণ করিয়াছে। আমি শনির উপরে বৃহস্পতি, শয়তানের পার্শে জেহোবা, আহ্রিমান-শত্রু ওরমজদ, মারবিজয়ী নির্ব্বাণ দেবতা। শ্মশানকূলবাহিনী জাহ্নবী, নিশীথ অন্ধকারে প্রস্ফুটিত ফুলদল, অসহায় ক্রন্দনের উপাসনা। আমি ধান্তরি হিরণ্যজ্যোতি, গিরিশিলার কলনিঝরিণী, ধূসর মৃত্তিকার শ্যাম রোমঞ্চ। আকাশ আমার আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারে না, আলোক কাঁপিয়া উঠিতেছে, গ্রহ জগৎ অপূর্ব্ব সঙ্গীতে তালে তালে নৃত্য করিতেছে। ধরণী ষড়ঋতুর নৃত্যচক্রে কখনও অবশ কখনও অশ্রুপ্লাবিত, কখনও নিন্দোলোৎসবে মাতিয়া উঠিতেছে। নিখিলের অশ্রুশিশির আমারই হাস্যকিরণে অরুণায়মান।

আমি রহস্যময়, আমি দুর্জ্ঞেয়। অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছে, উর্দ্ধে আকাশ ও নিম্নে জলস্থল আমার সত্তায় স্তম্ভিত হইয়া আছে। দিগন্তে মৃত্যুর চক্রনেমি সুষুপ্তির রাজ্য। আকাশে অমৃত আলোকের দীপালি-উৎসব, পৃথিবী-পৃষ্ঠে জীবন-মরণের আলোছায়া। আমিই আলোক, আমিই অন্ধকার; আমি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রাণশিখা, আমি অনির্ব্বাণ স্থির রশ্মি। আমি বৈতরণীর নাবিক স্বচ্ছ অন্ধকারে রজতচিক্কণ, খরস্রোতে আমার প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট দেখাইবে, জ্যোৎস্নালোকে আমার মুখ গুণ্ঠনাবৃত।

বিদ্রোহী

কাজী নজরুল ইসলাম

[শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ বি.এ. কর্তৃক আর্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দোতলা) কলিকাতা হ'তে প্রকাশিত এবং কান্তিক প্রেস, ২২ সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা হ'তে মুদ্রিত "অগ্নিবীণা'র দ্বিতীয় সংস্করণ হতে উদ্বৃত। প্রকাশকাল, আশ্বিন, ১৩৩০]

বল বীর–
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর –
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি',
ভুলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর
আমি চির-উন্নত শির।
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বী।
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম-কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানিনাকো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পোডো, আমি ভীম
ভাসমান মাইন,
আমি ধুর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর,
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব বিধাত্রীর!
বল বীর–
চির উন্নত মম শির!
আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,

আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ!
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল্!
আমি চপলা-চপল হিন্দোল!
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা'
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী, আমি ভীত এ ধরিত্রীর।
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার, আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর–
আমি চির-উন্নত শির।
আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর-মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে-চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ তূর্য!
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি' বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর–
চির উন্নত মম শির!

ইতোপূর্বে মুজফ্ফর আহমদ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কোন কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার অর্থ একটি অপরটির প্রতিলিপি নয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর কবিতার ভাব, উপমা ও দর্শনের গভীর মিল রয়েছে। তাই বলে কি আমরা বলবো রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা আত্মসাৎ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান এবং কবিতায় লালনের ভাবনা ও বাণীর মিল দেখা যায় এবং রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেছেন। তার মানে এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ বাউলের ভাব, ভাষা, উপমা, প্রতীকী–ব্যঞ্জনা নিয়ে তাঁর কবিতা সাজিয়েছেন। মুজফ্ফর আহমদ মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' কবিতার বিষয়ে আলোচনায় নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার উল্লেখ করে লেখেন:

"কোন্ সূত্র হতে মোহিতলাল তাঁর 'আমি'র 'ভাব নিয়ে' বা 'ভাবচুরি' করে বিদ্রোহী রচনার কথা বলেছিলেন তা সকলের জানা উচিত। ১৯২০ সালে একটি ঘটনা ঘটেছিল যার সঙ্গে আমারও অতি সামান্য যোগ ছিল। মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের যে প্রথম পরিচয় হয়েছিল তার এক দেড়মাস পরের কথা। একদিন বিকাল বেলায় নজরুল আর আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতে অফিসে যাই। মোহিতলালও এসেছিলেন সেখানে। আমি আগেই বলেছি যে নজরুলের সাহিত্য সমিতির যাওয়ার কথা আগেই সে মোহিতলালকে জানিয়ে রাখত। মোহিতলাল আফজালুল হক সাহেবের ঘরে তাঁর তখ্‌ৎপোশের উপরে বসেছিলেন। কি সব আলোচনা হচ্ছিল, তার মধ্যেই তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে সাহিত্য সমিতির লাইব্রেরীতে বাঙলা ১৩২১ সালের 'মানসী' আছে কিনা। 'মানসী ও মর্মবাণী' নয়, 'মানসী'। প্রথমে 'মানসী'ই বার হয়েছিল পরে মর্মবাণী'র সঙ্গে মানসী একীভূত হয়ে 'মানসী' ও 'মর্মবাণী' নাম হয়েছিল। সাহিত্য সমিতির লাইব্রেরীতে ১৩২১ সালের 'মানসী' থাকা খুবই সম্ভব এই কথা জানিয়ে আমি লাইব্রেরীতে তা খুঁজতে গেলাম এবং আলমারী খুলে দেখতে পেলাম যে ১৩২১ সালেরই বাঁধানো 'মানসী' যেখানে রয়েছে। এই বাঁধানো 'মানসী' আমি মোহিতলালকে এনে দিলাম। তিনি পৌষ মাসের 'মানসী' হতে শ্রী মোহিতলাল মজুমদার বি.এ অর্থাৎ তাঁরই লিখিত 'আমি' শীর্ষক একটা গদ্য লেখা নজরুল ইসলামকে পড়ে শোনালেন। নজরুল ছাড়া আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আফজালুল হক সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা আজ আমার মনে নেই।

মোহিতলাল জোরে জোরে তাঁর লেখাটি পড়েছিলেন। আগেই বলেছি যে তখ্‌ৎপোশের ওপরে বসে তিনি লেখাটি পড়েছিলেন নজরুল খানিকটা পেছিয়ে এমনভাবে বসেছিল যে যাতে মোহিতলালের পড়ার সময়ে সে তাঁর নজরে না পড়ে। আজ স্বীকার করতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই যে মোহিতলালের লেখাটি আমি উপভোগ করতে পারি নি। নজরুলের বসার কায়দা হতে আমার মনে হয়েছিল যে মনোযোগ সহকারে লেখাটি শোনার জন্যে সেও প্রস্তুত ছিল না। তবে, সে কবি মানুষ। হিন্দুশাস্ত্রও তার কিছু কিছু পড়া ছিল। আমার চেয়েও মোহিতলালের লেখাটি তার অনেক ভালো বোঝার কথা। কিন্তু মোহিতলালকে তাঁর 'আমি' একবার মাত্র পড়তে শোনার এক বছরেরও বেশী সময় পরে, – ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল তার 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করেছিল।একবার মাত্র শুনে এত দীর্ঘকাল পরে সে 'আমি'র ভাব সম্পদ 'নিয়ে' বা 'চুরি করে' যে বিদ্রোহী রচনা করেছিল আমি তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি। কারণ আমি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সব কিছু নিজের চোখে দেখেছি। নজরুল যদি এতই শ্রুতিধর ব্যক্তি ছিল যে একবার মাত্র শুনেই তার সব কিছু মুখস্থ ও আয়ত্ব হয়ে যায়, তবে তার অপরের ভাব গ্রহণ বা চুরি করার প্রয়োজনই বা কি? এটা আমি মানতে রাজী আছি, মোহিতলাল লেখাটি পড়তে শুনে তার মনে হয়তো একথাই আসতে পারে যে এ ধরণের একটি কবিতা লেখা যায়।

মোহিতলাল বড় কবি ছিলেন, বড় পণ্ডিতও ছিলেন এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু তিনি মানুষও তো ছিলেন। কোন মানুষ যতই মহান হোন না কেন, জীবনের কোন দুর্বল মুহূর্তে তিনি ক্ষুদ্রও তো হতে পারেন। নজরুল ইসলাম যে তাঁর আওতা হতে, তাঁর শাসন হতে বেরিয়ে গেল, তাঁর জন্য তিনি তাঁর ওপরে খানিকটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন।

নজরুল যদি মোহিতলালের আওতায় থেকে গিয়ে তার 'বিদ্রোহী' রচনা করত (আমার বিশ্বাস সে কিছুতেই তা পারত না) তা হলে 'আমি'র ভাব নিয়ে বা চুরি করে লেখার কোনো কথাই তিনি তুলতেন না। সেই অবস্থায় মোহিতলাল হতেন নজরুলের 'বিদ্রোহী'র প্রধান প্রচারক ও গুণগ্রাহক যেমন তিনি অনেক পরে হয়েছিলেন সজনীকান্ত দাসের 'ব্যাঙ' কবিতার গুণগ্রাহী ও প্রচারক। এই দিকটি তলিয়ে বোঝার প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা না করলে আজকাল সমালোচকরা সঠিক সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারবেন না।" (মুজফ্‌ফর আহমদ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১২৫)

মজফ্‌ফর আহমদ এ বিষয়ে আরো দীর্ঘ লেখা লিখেছেন। কিন্তু আমার আলোচনায় তা অপ্রয়োজনীয় বোধ করে তা উল্লেখ করলাম না। মজফ্‌ফর আহমদ উপরিউক্ত বক্তব্যে যা তুলে ধরেছেন তা যুক্তিসঙ্গত। মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি', ত্যৎকালীন সুধী মহলে আলোড়ন আনতে পারেনি। এমন কি সে বিষয় অদ্যাবধি তেমন কোন আলোচনা চোখে পড়েনি। একজন কবি বা সাহিত্যিক কোন একজন দ্বারা প্রভাবিত হতেই পারেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে All great men think alike. নজরুল 'আমি' কবিতা পড়ে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সে মর্মে তিনি যে কবিতা লিখছেন তা অসাধারণ, অভূতপূর্ব এবং অনুপম। বলতে কি, সারা পৃথিবীকে তিনি তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কেবল এই কবিতায় মুসলমান কবি-সাহিত্যিক ও গোঁড়া হিন্দুদের তিনি বিরাগ ভাজন হয়েছেন। মোহিতলাল নজরুলকে একজন গুণগ্রাহী ভেবেছিলেন বিধায় তাঁর কাছে নিয়ে কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। অনেক আগে প্রকাশিত হলেও সে সময়ে তাঁর এই কবিতা সম্পর্কে নজরুলও কিছু জানতেন না এবং তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তেমন কোন আলোচনা প্রকাশিত হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের একসময় বন্ধুত্ব হয়েছিল। নজরুল তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। নজরুলের কবিতা পাঠ করে মোহিতলাল মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর সে অনুভূতির কথা তিনি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় সম্পাদককে জানিয়ে দিয়েছিলেন। নীচে তার বিবরণ দেওয়া হল।

'মোসলেম ভারতে' নজরুল সম্বন্ধে মোহিতলালের পত্র

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার পত্রিকার দুই সংখ্যা সম্প্রতি পাঠ করিয়া যে আনন্দ আশা ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়াছি তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটা লিখিয়া পাঠাইলাম, যদি আবশ্যক মনে করেন পত্রিকায় মুদ্রিত করিবেন।

মুসলমান সমাজের নবজাগরণের অনেক লক্ষণ সর্বত্র দেখা যাইতেছে, কিন্তু বাঙলা দেশে সেই লক্ষণ নিশ্চয় হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সাধনায়। আমি যতদূর লক্ষ্য করিয়াছি তাহাতে আপনার এই 'মোসলেম ভারত' পত্রে সে সাধনা সিদ্ধির পরিচয় আছে। নিশ্চয়ই নির্জন ও অপেক্ষাকৃত অপ্রকাশ সাধনার অবকাশে মুসলমান ভ্রাতৃগণ পূর্ব হইতেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, নতুবা সহসা এমন সুন্দর ভাষা ও উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভব হইত না।

আমার অনেক দিন হইতে একটা ক্ষোভ ছিল এই, যে বাঙ্গালী হইয়া মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন থাকায়, মুসলমানগণ আমাদের এই সর্বাপেক্ষা গৌরবের ধন সাহিত্য ও ভাষাকে তাহার পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছেন না, এবং নিজেরাও তাঁহাদের হৃদয়নিহিত মনুষ্যত্বের, স্বধর্ম ও স্বকীয় সাধনার বিশিষ্ট সৌন্দর্যের অবাধ স্ফূর্তির অভাবে প্রাণে মনে পঙ্গু হইয়া রহিলেন। কেননা, পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, যে শব্দ যে বাণী মানবাত্মার হৃদয় রহস্যের একমাত্র প্রকাশপন্থা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিরঞ্জন, গুহাশ্রায়ী অন্তরদেবতা জীবনলীলায় মূর্তি ধারণ করেন–সেই বাক্, সেই ব্যক্তিত্বাবগুণ্ঠিত ব্রহ্ম্যের আত্মসৃষ্টি বা আত্মপ্রসারের আদি চেষ্টা মাতৃভাষাতেই সম্ভব। সেই বাণীকে অবহেলা করিলে আপনাকে হারাইতে হয়। আত্মবিস্মৃত মুসলমান সমাজ যেন যুগধর্ম বশে অবশে অজ্ঞাতে সেই সাধনমন্ত্র চিনিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে আমাদিগকেও সেই সত্য-সুন্দর বিচিত্র মধুর স্বরূপ দেখাইতে সমর্থ হইবেন। নহিলে এই সাহিত্যসাধনার মধ্যে তাঁরা যে খাঁটি বাঙ্গালী এই প্রচ্ছন্ন সত্য কেমন করিয়া এমন প্রকাশ হইয়া উঠিল ?

এইবার এক নতুন রসধারা, নবজীবনের আবেগ–প্রবাদ আমার এই অতি আদরের, আজন্ম সাধনার, শ্রেষ্ঠ অনুচিকীর্ষার ধন বঙ্গ সাহিত্যের অকালে পৌঢ়ত্ব মোচন করিয়া, তাহার অঙ্গে অঙ্গে যৌবন–হিল্লোল সঞ্চারিত করিবেন। পারস্যের গোলাববাগিচার বুলবুল তাহার বৈতালিক হইবে, আররের মরুপ্রান্তরে দূর মরুদ্যানের খর্জুরকুঞ্জের আড়ালে দিয়া যে বৃহৎ চন্দ্রোদয় হয়, তাহার আলোকে বঙ্গ ভারতীর জরীন শাড়ী ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিবে। অনন্ত বালুরাশির দৈনন্দিন দহনজ্বালা, নিরুদ্দেশ মরুসমীরণের প্রদোষকালীন হাহাশ্বাস, নিশীথ আকাশের দিগন্ত বিসর্পী মহামৌনী নক্ষত্রসভা–– জাগরণ স্বপ্ন-সুষুপ্তির

ত্রিসন্ধ্যার ত্রিবিধ মন্ত্রে বঙ্গ ভারতীর অর্চনারতি হইবে। একটি অভিনব সম্ভাবনা, অপূর্ব সম্পদ নতুন সুর সংযোজনার আশা আমাকে সত্যই চঞ্চল করিয়াছে।

পত্রিকার প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনার মত সুন্দর কিছু এ পর্যন্ত চোখে পড়ে নাই। যেন, সাহিত্যের যে নব সাধনায় আপনারা ব্রতী হইয়াছেন, তাহার ভাবগত আদর্শকে তুলিকার সাহায্যে চক্ষুগোচর করা হইয়াছে,––কি সুসঙ্গত সুষমা! বাণীর কি পবিত্র সুন্দর পুষ্পপীঠিকা। আমার নিবেদন, যদি সম্ভব হয়, তবে জগদ্‌বিখ্যাত পারশ্য কারুশিল্পের (decorative art) এই জাতীয় চিত্রলিপি মুদ্রিত করিবেন; পারশ্যের art-idea এই চাক্ষুষ বিগ্রহের সহিত বঙ্গীয় পাঠকের পরিচয় সাধন করিবার অন্য উপায় দেখিনা।

মুসলমান লেখকের সকল রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গালা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী–এক কথায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গলার স্বারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আমার বিশ্বাস, প্রকৃত সাহিত্যমোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি। বাঙ্গলার কবি–মালঞ্চে আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে, মলয় সমীরণের অভাবে ব্যজনী বিজন চলিয়াছে। এহেন সময়ে নূতন দিক হইতে নূতন হাওয়া বহিতে দেখিয়া গুমটাক্লিষ্ট প্রাণে বড়ই আরাম পাইয়াছি। বাঙ্গলা কাব্যলক্ষ্মীর ভূষণ-শিঞ্জন, তাহার নটিনীলাঞ্জন নৃত্যলীলা ও নূপুরনিক্কন মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন শব্দ সমষ্টি, কৃত্রিম নিয়মশৃঙ্খলিত নীরস কঠিন ধাতুর আওয়াজ, মানবকণ্ঠের অকৃত্রিম ভাবগম্ভীর জীবনোল্লাসময় স্বরবৈচিত্র্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে; অসংখ্য কাব্যরসমাত্রবঞ্চিত অসার অপদার্থ কবি–যশঃপ্রার্থীর ঝিল্লীর স্বরে বাঙ্গলা–কাব্যে অকাল সন্ধ্যার অবসাদ নির্জীবিতা সূচিত হইতেছে। আপনার পত্রিকাতেও হিন্দু কবির সেই ঝিল্লীধ্বনি আছে। কিন্তু কাজী সাহেবের দুইটি কবিতা (অন্যগুলি পড়িবার সৌভাগ্য এখনও হয় নাই) পড়িলাম, তাহা দ্বারা 'মোসলেম ভারতের' গৌরব রক্ষা হইয়াছে, বাঙ্গলা কবিতার মান বাঁচিয়াছে, লেখকও পাঠকদের মধ্যে চিত্তবিনিময় হইয়াছে।

কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষ নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কণ্ঠ ভারতীয় ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া, ইদানিং কেবলমাত্র শ্রবণপ্রীতিকর প্রাণহীন চারুচাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির

কবিতায় তাহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া, মানবকণ্ঠের স্বর সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। 'খেয়াপারের তরণী, শীর্ষক কবিতার ছন্দ সর্বত্র মূলত এক হইলেও, মাত্রা বিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে। ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথায়ও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই, ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে–কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই–এই প্রকৃত কবি শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতা আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায়, যে শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর, কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতি প্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দবিন্যাস ও ছন্দ ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত কবিব,-

আবুবকর উসমান উমর আলী হাইদর,–
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী-মুখে সারি গান 'লা শরীক আল্লাহ'!

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ বিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে; বিশেষ এ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য 'লা শরীক আল্লাহ' যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য, প্রয়োগ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্যযোজনা বাঙ্গলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনিগাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।

"বাদল প্রাতের শরাব" শীর্ষক কবিতায় ইরানের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটিতে কবির 'মস্ত' হইবার ও 'মস্ত' করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেই ইহার উচ্ছল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনি জয়যুক্ত হউক।

পরিশেষে একটা বিনীত নিবেদন আছে। যে সকল ফার্সি শব্দ দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার আচার প্রথার সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমানের নিজ ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সেগুলি না থাকিলে মুসলমান-জীবনের বাস্তব চিত্র বঙ্গ সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিবে না এবং অনেক স্থলে যে শব্দগুলিই ভাষার একটি ভঙ্গিরূপে পরিগণিত হইবে––সেগুলিকে আমাদের মতো নিরক্ষর হিন্দু পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য (অন্ততঃ প্রথম কিছু দিন) কি উপায় করিতে পারেন? নমস্কারান্তে নিবেদন ইতি। ('মোসলেম ভারত' ভাদ্র, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ-আগষ্ট, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ)।

মোহিতলাল মজুদার লিখিত এই বিশাল পত্র কোন তারিখের উল্লেখ ছিল না। মুজফ্ফর আহমদ বলেন যে, 'মোসলেম ভারত' এর সম্পাদক এই পত্রখানা ১৩২৭

সালের শ্রাবণ মাসে পেয়েছিলেন এবং ১৩২৭ সালের ভাদ্র মাসে তা ছাপা হয়। এই পত্র লেখার আগে মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল পরস্পরকে চিনতেন না। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে নজরুল ও মোহিতলাল সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। তাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, যে মোহিতলাল নজরুল থেকে ১১ বৎসর বড় ছিলেন। মুজফ্ফর আহমদ এবং নজরুল তখন একই সঙ্গে থাকতেন। তবে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নজরুলকে মোহিতলালের বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেইটিই ছিল উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ। নজরুল কৃতজ্ঞতাবশত মোহিতলালের নিকট গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মুজফ্ফর আহমদের নিকট নজরুল তাদের সাক্ষাতকারের বিবরণ দিয়েছিলেন। মুজফ্ফর আহমদ লেখেনঃ

"নজরুল রাত্রে ফিরে এসে সব খবর আমাকে দিল। বলল, অনেক সব সাহিত্যিকের সম্বন্ধে মোহিতলালের মনোভাব তিক্ত। তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই তাঁর তীব্র অভিযোগ। নজরুলকে তিনি বলেছেন যে তাকে খুব সতর্ক হয়ে চলতে হবে। তার জনপ্রিয়তা কেউ সহ্য করতে চাইবে না ইত্যাদি। সর্বোপরি মোহিতলাল নজরুলকে দিয়ে ওয়াদা করিয়ে নিয়েছিলেন যে নজরুল কিছুতেই তার লেখা–'প্রবাসী'তে ছাপাবেনা।

নজরুলের মুখে এই কথা শুনে আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেম। আমি কেবলই ভাবছিলেম প্রথম সাক্ষাতেই কি করে মোহিতলাল এত সব কথা নজরুলকে বলতে পারলেন? কতটা তিনি চিনেছিলেন নজরুলকে? তার ওপরে নজরুলকে দিয়ে তিনি যে 'প্রবাসী' তে লেখা না ছাপানোর ওয়াদা করিয়ে নিলেন এটা কি ভালো কাজ করলেন তিনি? 'প্রবাসীর'র তখন প্রতিষ্ঠা ও প্রচার দু-ই বেশী। 'প্রবাসীতে' লেখা না ছাপালে নজরুল ইসলামের মতো একজন উদীয়মান কবি কি করে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে? সেকালে অনেকেই এই ধরনের ধারণা পোষণ করতেন। (মুজফ্ফর : পৃঃ ১১৬)

মুজফ্ফর আহমদের লেখা থেকে আরো জানতে পারা যায় যে, নজরুল মোহিতলালের কথা মত তাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকা পর্যন্ত কোনো লেখা 'প্রবাসী' তে পাঠাননি। পাঠিয়েছিলেন তখন, যখন তাঁদের বন্ধুত্বের 'ছেদ' পড়েছিল।

নজরুল মোহিতলাল মজুমদারকে 'গুরু'র পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। কিন্তু প্রবাসীতে নজরুলের কোনো কবিতা না ছাপানোর জন্য মোহিতলালের অনুরোধ আদৌ বোধগম্য নয়। নজরুলের কবিতা সম্পর্কে মোহিতলাল ছাড়াও আরো অনেকে পত্র লিখে নজরুলকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শান্তিনিকেতন থেকে শ্রী সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর লেখা অন্যতম। সুতরাং এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে নজরুল তাঁর লেখার জন্য শুধু মোহিতলাল নন, রবীন্দ্র অনুরাগী ব্যক্তির এবং অন্যান্যদেরও অভিনন্দন পেয়েছিলেন। তবে একথা বলা যায় যে, নজরুলের সঙ্গে পরিচয় না থাকা অবস্থায় মোহিতলাল তাঁর লেখনিতে নজরুলের সাহিত্যকর্মের প্রতি যে মর্যাদা দিয়েছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে তিনি সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বস্তুত, মুঘলআমলে ফার্সি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানেরা

হিন্দুদের অপেক্ষা এগিয়ে ছিল। চাকুরী ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মুসলমানেরা অগ্রগামী ছিল। কিন্তু বৃটিশদের ভারত দখলের পর ইংরেজি ভাষা হিন্দুরা দ্রুত শিখে নিয়ে চাকুরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানদের থেকে অনেক অগ্রসর হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবার কারণে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও তাদের বিশাল অবদান ছিল। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবি ও উপন্যাসিকগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় নিজেকে শুধু প্রতিষ্ঠিতই নয়, বিদেশীদের কাছেও সম্মানের পাত্র হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হয়ে বাঙ্গালী জাতির মর্যাদাকে বিশ্বব্যাপী করে তুললেন। মুসলমানেরা ইংরেজি ভাষাকে 'কুফরী' ভাষা জ্ঞান করে তার শিক্ষা এবং চর্চার জন্য এগিয়ে আসেননি। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর এই চিঠিতে মুসলমান তথা নজরুলকে সাহিত্যচর্চায় একদিকে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তেমনি নজরুলের প্রতিভাকেও তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। নজরুল তাঁকে অভিভাবক হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। নজরুল যে অসাধারণ মেধাবী এবং প্রতিভাবান ছিলেন মোহিতলাল তাঁর কবিতা পাঠ করে তা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সে কারণে নজরুলের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তিনি নজরুলের বাসায় এসে তাঁকে নিজের লেখা শোনাতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর লেখা 'আমি' কবিতা পাঠের পেছনে এই মনোভাব সক্রিয় ছিল।

মোহিতলাল মজুমদার সে সময় একজন প্রতিষ্ঠিত কবি ও সমালোচক। অবশ্য 'মোসলেম ভারত' ও নজরুলকে নিয়ে মোহিতলাল মজুমদার তাঁর লেখা চিঠিতে প্রশংসার আড়ালে যেটি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সাহিত্যচর্চায় মুসলমানেরা এ যাবৎকাল তেমন কিছু করতে সক্ষম হয়নি। নজরুলের কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে 'মোসলেম ভারত' এ বিষয়ে একটি বড় দায়িত্ব পালন করেছেন। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় মুসলমানদের অনেক লেখা পাঠ করে তিনি সংশয়মুক্ত হয়েছেন যে সাহিত্যচর্চায় এতদিন মুসলমানদের লেখা তেমন প্রশংসিত না হলেও তাঁরা গোপনে সাহিত্যচর্চা করছিলেন নচেৎ 'সহসা এমন সুন্দর ভাষা ও উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভব হইতো না।' অবশ্য তাঁর বক্তব্যে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা এমন যে এতদিন হিন্দুরাই বাঙালা ভাষার উন্নতি ঘটিয়ে এসেছেন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁরাই অগ্রণী। মোহিতলাল বলেন; 'আমার অনেকদিন হইতে একটা ক্ষোভ ছিল এই যে, বাঙ্গালী হইয়া মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন থাকায়, মুসলমানগণ আমাদের এই সর্বাপেক্ষা গৌরবের ধন সাহিত্য ও ভাষাকে তাহার পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছেন না, এবং নিজেরাও তাহাদের হৃদয় নিহিত মনুষ্যত্বের স্বধর্ম ও স্বকীয় সাধনার বিশিষ্ট সৌন্দর্যের অবাধ স্ফূর্তির অভাবে প্রাণে-মনে পঙ্গু হইয়া রহিলেন।" (পৃঃ ১১৩)

এই চিঠিতে তিনি মুসলমানদের দুর্বলতার কথা তুলে ধরেছেন এবং তাঁরা যে অনেকটাই আত্মবিস্মৃত জাতি' সে কথাটিও তিনি সহাসিকতার সঙ্গে বলতে পেরেছেন, সে জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, বাংলা সাহিত্যে নজরুল যে সর্বপ্রথম নতুন ধারা, ভাব-ভাষা এবং ছন্দ এনেছিলেন, মোহিতলাল মজুমদার

নিঃসঙ্কোচে তা স্বীকার করেছেন। স্বীকারই শুধু নয়, তিনি নজরুলকে প্রাণঢালা অভিনন্দনও জানিয়েছেন। মোহিতলাল আরো বলেছেন যে, মুসলমানেরা এতদিন ফার্সিভাষা চর্চা করে আসছেন সে কথা ইংগিতে প্রকাশ করে মাতৃভাষার চর্চার প্রতি তাঁদের তিনি আহবান জানিয়েছেন। নজরুল মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' কবিতা শুনবার অনেক পরে 'বিদ্রোহী' লিখেছিলেন। কবিতার ভাব ও রচনাশৈলীতে আপাত দৃষ্টিতে সাদৃশ্য আছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দুটি কবিতা আদৌ এক নয়। বলা যেতে পারে, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা অনেক বেশী কাব্যময় এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ। এ কারণে নজরুল খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি এত বেশী জনপ্রিয় হয়েছে যে সে তুলনায় 'আমি' কবিতা তা হয়নি। ইতোপূর্বে আমরা মোহিতলাল ও নজরুলের মধ্যে বন্ধুত্বের কথা বলেছি। মোহিতলাল প্রায়শঃ নজরুলের কাছে আসতেন তাঁকে তাঁর কবিতা শুনাবার জন্যে। মোহিতলাল চমৎকার আবৃত্তি করতে পারতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করবার অনেক আগে থেকেই মোহিতলাল এবং নজরুলের মধ্যে সখ্যতার পরিবর্তন এসেছিল। নজরুল তাঁর অভিভাবকত্ব মানতে রাজি ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহমদ বলেন ঃ

"১৯২১ সালে যখন ৩/৪ সি, তালতলা, লেনের বাড়ীতে থাকতেন তখন মোহিতলাল আমাদের বাড়ীতে বেশী বেশী এসেছেন এবং যে দিনই এসেছেন, থেকেছেনও বেশীক্ষণ। যদিও নজরুল আমায় কোনো দিন কিছু বলেনি তবুও আমার মনে হচ্ছিল যে মোহিতলালের বিরুদ্ধে নজরুলের মনে একটা বিরূপতা ধীরে দানা বেঁধে উঠেছে। নজরুল মোহিতলালের অভিভাবকত্ব আর যেন সহ্য করতে পারছিল না। একদিন এই ব্যাপারটি আরও খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ১৯২১ সালের দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মোহিতলালের স্কুল বন্ধ ছিল। এই ছুটির সময়ে তিনি ব্যারাকপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন। আমি যখন এই বিষয়টি 'বিংশ শতাব্দী'তে লিখেছিলাম তখন ছুটিতে মোহিতলালের ব্যারাকপুর থাকার কথাই লিখেছিলেম। কিন্তু আমার বই (কাজী নজরুল প্রসঙ্গে) ছাপা হওয়ার সময়ে একজন বন্ধু আমার জানালেন যে, মোহিতলালের বাড়ী কাঁচরাপাড়ায়, তাই ছুটিতে তিনি নিশ্চয় কাঁচরাপাড়াতেই ছিলেন। এতে আমার মনে যে ধোঁকার সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে আমি লিখেছিলেম যে তাঁর বাড়ী ব্যারাকপুর কিংবা কাঁচরাপাড়ার দিকে ছিল।" এখন জানতে পেরেছি যে মোহিতলালের বাড়ী কাঁচরাপাড়ায় ছিল সত্য, কিন্তু ১৯২১ (১৩২৮) সালের দুর্গাপুজার ছুটিতে তিনি ব্যারাকপুরেই ছিলেন তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে। সমসাময়িক অন্য ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে এখন আমি নিশ্চিত হয়েছি যে ছুটিটা দুর্গাপুজারই ছিল। যাক, যা অমি বলতে চেয়েছিলেম। এই ছুটির সময়ে মোহিতলাল একদিন তাঁর নব-রচিত একটি কবিতা পকেটে নিয়ে আমাদের তালতলা লেনের বাড়ীতে এলেন। কবিতাটি তিনি নজরুলকে পড়ে শুনালেনও। মোহিতলাল আশা করেছিলেন যে কবিতা শুনে নজরুল একটা আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে। আমি তাকে যতটা দেখেছি তাতে এই রকম অবস্থায় উচ্ছসিত হয়ে

ওঠাই ছিল তার স্বভাব। আশ্চর্য এই যে সে দিন সে বিরুদ্ধ কাজই করল, অর্থাৎ কবিতা শোনার পরে তেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না। মোহিতলাল মনে মনে আহত হলেন। অবশ্য, কবিতা পড়া হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি অনেকক্ষণ বসেছিলেন। অনেক কিছু আলাপও করেছিলেন নজরুলের সঙ্গে। এর মধ্যে আমি পোষাক পরে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেম। সময়টা বিকাল বেলা ছিল। মোহিতলাল আমাকে বললেন,"দাঁড়ান, আমিও যাব আপনার সঙ্গে।" তিনি নজরুলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে আমার সঙ্গেই ঘর হতে বা'র হয়ে এলেন। আমাদের বাড়ী বড় রাস্তা হতে অনেকখানি ভিতরের দিকে ছিল। তিনি আমার সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে আমাকে খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন, "দেখুন, ট্রেনের পয়সা খরচ করে আমি ব্যারাকপুর হতে নজরুলকে আমার নূতন লেখা কবিতা শোনাতে এসেছিলেম। কবিতা শুনে সে কোনো রকম আনন্দই প্রকাশ করল না।" নজরুল যে তার স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করেছে তা আমি বুঝেছিলেম, কিন্তু মর্মাহত মোহিতলালকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা ছিল না। তবে এটা যে ঝড়ের পূর্ব-লক্ষণ তা সেদিন বুঝেছিলেম।

সময়টা ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর, না অক্টোবর মাস ছিল তা আমি সঠিক বলতে পারব না, তবে সেটা যে দুর্গাপূজার ছুটির সময় ছিল তা তো আমি আগেই বলেছি। অন্যভাবে হিসাব করলে বলতে হয় যে নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের যে পরিচয় হয়েছিল তার একবছর তখন কেটে গিয়েছিল। এই হিসাবটা আমি এখানে দিচ্ছি এই কারণে যে নজরুল আর মোহিতলালের প্রকৃত ছাড়াছাড়ি সেই দিনই হয়েছিল। তারপরেও ওই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোহিতলালের আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত চলেছিল। কিন্তু সেই যাতায়াতে কোনও আন্তরিকতা ছিল না। মোহিতলাল মুজমদারের অভিভাবকত্বের ভার নজরুল ইসলাম আর কিছুতেই বহন করতে পারছিল না। এই অভিভাবকত্ব হতে বার হয়ে আসা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যদি সে এইভাবে বা'র না হয়ে আসত তবে সে কাব্য ও সাহিত্য জগতে বেঁচে থাকতে পারত না। সত্য সত্য নজরুল সে দিন বেঁচে গিয়েছিল। সে প্রকৃতই সে দিন নিজেকে মুক্ত ও স্বাধীন ভাবতে পেরেছিল। মোহিতলালের মন যুগিয়ে চলা যে কী দুঃসহ ও দুঃসাধ্য কাজ ছিল সেটা যাঁরা খুব নিকট থেকে নজরুল মোহিতলালকে দেখেন নি তারা বোঝেন নি। শুধু সাহিত্যিক আড্ডায় বসে এ ব্যাপারে বোঝা যায় না।" (মুজফ্ফর আহমদ : পৃ. ১১৯-১২৯)

নজরুল ও মোহিতলালের বিষয়টি নিয়ে এই বিস্তৃত বিবরণটি প্রয়োজন ছিল এ কারণে যে উভয়ের সম্বন্ধে মুজাফ্ফর আহমদ ভিন্ন অপর কেউ আর জানতো না। নজরুলকে যথাযথভাবে বুঝতে শৈলজানন্দের পরে মুজাফ্ফর আহমদই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নজরুলকে ঘনিষ্টভাবে জানতেন এবং নজরুলের জীবনের অনেক ঘটনার তিনি নীরব সাক্ষী ছিলেন।

আমার ধারণায় নজরুলকে নিয়ে মুজফ্ফর আহমদ যে 'স্মৃতিকথা' লিখেছেন তা নানা দিক থেকে অমূল্য। তিনি রাজনৈতিকভাবে 'সাম্যবাদ'কে বিশ্বাস করেছেন এবং বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। নজরুলের মধ্যে এই ভাবটি গভীরভাবে সাম্যবাদী দর্শনের সঙ্গে একীভূত ছিল। মুজফ্ফর আহমদ সাহিত্যিক ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত ও মেধাবী মানুষ ছিলেন। ডঃ জনসন-এর জীবনীকার বসওয়েল এর সঙ্গেই কেবল বোধকরি, তাঁর তুলনা চলে।

আমি অবাক হই রাজনীতির মতো কঠিন জীবনের মধ্যে থেকেও তিনি নজরুলেকে প্রীতি ও ভালবাসায় শুধু সিক্তই করেননি, তাঁর সমস্ত জীবন দিয়েই তিনি নজরুলকে আগলিয়ে রেখেছিলেন। অবশ্য এখানে মোহিতলালের মতো তাঁর কোন অভিভাবকত্ব ছিল না। নজরুলের বেড়ে ওঠার পেছনে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল এবং নজরুলকে নিয়ে তাঁর এই গ্রন্থ নজরুল গবেষণার জন্য একটি অপরিহার্য গ্রন্থ।

মোহিতলাল সম্পর্কে তাঁর মতামত যথাযথ। তবে তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, নজরুলের প্রতি মোহিতলালের অসন্তুষ্টি থাকলেও তিনি নজরুলকে ভালবেসেছিলেন এবং তাঁকে তিনি নিজের মতো করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' রচনা করেছিলেন ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বড় দিনের ছুটিতে। মুজাফ্ফর আহমদই ছিলেন নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম শ্রোতা। নজরুলের এই 'বিদ্রোহী'র রচনার ইতিহাস তিনি তার গ্রন্থে দিয়েছেনঃ

"আমার মনে হয় নজরুল ইসলাম শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে কবিতাটি লিখেছিল। তা না হলে এত সকালে সে আমায় কবিতা পড়ে শোনাতে পারত না। তার ঘুম সাধারণত দেরীতেই ভাঙত, আমার মতো তাড়াতাড়ি তার ঘুম ভাঙত না। এখন থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে নজরুলের কিংবা আমার ফাউন্টেন পেন ছিল না। দোয়াতে বারে বারে কলম ডোবাতে গিয়ে তার মাথার সঙ্গে তার হাত তাল রাখতে পারবে না, এই ভেবেই সম্ভবত সে কবিতাটি প্রথমে পেন্সিলে লিখেছিল।

সামান্য কিছু বেলা হতে 'মোসলেম ভারতের' আফজালুল হক সাহেব আমাদের বাড়ীতে এলেন। নজরুল তাঁকেও কবিতাটি পড়ে শোনালেন। তিনি তা শুনে খুব হইচই শুরু করে দিলেন, আর বললেন, "এখনই কপি করে দিন, কবিতাটি আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।" পরম ধৈর্যের সহিত কবিতাটি কপি করে নজরুল তা আফজাল সাহেবকে দিল। তিনি এই কপিটি নিয়ে চলে গেলেন। আফজালুল হক সাহেব চলে যাওয়ার পরে আমিও বাইরে চলে যাই। তারপরে বাড়ীতে ফিরে আসি বারোটার কিছু আগে। আসা মাত্রই নজরুল আমায় জানাল যে 'অবিনাশদা' (বারীণ ঘোষদের বোমার সহবন্দী শ্রী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) এসেছিলেন। তিনি কবিতাটি শুনে বললেন, "তুমি পাগল হয়েছ নজরুল, আফজালের কাগজ কখন বার হবে তার স্থিরতা নেই, কপি করে দাও 'বিজলী'তে ছেপে দিই আগে।" তাকেও নজরুল সেই পেন্সিলের লেখা হতেই কবিতাটি কপি করে দিয়েছিল। ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারী (মোতাবেক ২২শে পৌষ ১৩২৮

বঙ্গাব্দ) তারিখে শুক্রবারে 'বিদ্রোহী' 'বিজলী'তেই প্রথম ছাপা হয়েছিল। বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কাগজের চাহিদা এত বেশী হয়েছিল যে শুনেছিলাম সেই সপ্তাহের কাগজ দু'বার ছাপা হয়েছিল। অনেকে যে লিখেছেন 'বিদ্রোহী' 'মোসলেম ভারতে' প্রথম ছাপা হয়েছিল সেটা ভুল। আফজাল সাহেব কার্তিকের সময় মোসলেম ভারতের জন্য যখন কপি নিয়ে গিয়েছিলেন তখন পৌষ মাস ছিল। আমার ধারণা, তার কার্তিক সংখ্যা ফাল্গুন মাসের আগে বার হয়নি। 'মোসলেম ভারত' নিয়মিত বার হত কিনা সেটা আজ যাঁরা নজরুল সম্বন্ধে লিখছেন তাঁরা কি করে বুঝবেন? তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন কার্তিক (১৩২৮) মাসের 'মোসলেম ভারতে' বিদ্রোহী' ছাপা হয়েছিল, আর ছাপা হয়েছিল ২২ শে পৌষের (১৩২৮) 'বিজলীতে'। কাজেই তাদের পক্ষে এটাই ধরে নেওয়া হিসাব সঙ্গত যে 'মোসলেম ভারতেই' 'বিদ্রোহী' প্রথম ছাপা হয়েছিল। আসলে কিন্তু পৌষ মাসের (১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের) আগে নজরুল ইসলাম তার 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনাই করেনি। কাজেই 'বিদ্রোহী' প্রথম ছাপানোর সম্মান 'সাপ্তাহিক বিজলী'র প্রাপ্য। তবে কবিতাটি কার্তিক সংখ্যার 'মোসলেম ভারতে' ছাপানোর জন্য নজরুল প্রথম আফজালুল হক সাহেবেকে দিয়েছিল। সেই জন্যে এই কার্তিক সংখ্যা মোসলেম ভারতের নামাল্লেখ করেই 'বিজলী' কবিতাটি প্রথম ছেপেছিল, যদিও কার্তিক মাসের 'মোসলেম ভারত' কখন ছাপা হবে তা কেউ সেই পৌষ মাসেও জানতেন না।

আবার শ্রী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যও 'মাসিক বসুমতিতে'তে (কার্তিক ১৩৬২) পুরানো কথা লিখতে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে খানিকটা তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন পেন্সিলে লেখা কবিতাটি নিয়ে শুধু তাঁকে শোনাবার জন্যেই নজরুল তাঁদের প্রেসে গিয়েছিল। তিনি জোর করে কবিতাটি 'বিজলি'র জন্যে রেখে দেন। এই বিষয়ে নজরুল আমায় যা বলেছিল তা আমি ওপারে লিখেছি। অবিনাশ বাবু বলেছেন নজরুল পড়ছিল, আর তিনি তার শ্রুতিলিখন করছিলেন। নজরুল কখনও এইভাবে কবিতা ছাপতে দিতনা। সে নিজ হাতে কপি করে কবিতা ছাপতে দিত। 'বিদ্রোহী'র বেলায়ও সে পেন্সিলের লেখা হতে নিজে কালিতে লিখে সেই কপি অবিনাশ বাবুকে দিয়েছিল। ঘটনার চৌত্রিশ বছর পরে এই সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর স্মৃতি তাঁকে বিভ্রমে ফেলেছিল। আসলে অবিনাশ বাবু নজরুলের আপন হাতের কপি করা 'বিদ্রোহী' কবিতা 'বিজলী'তে ছাপতে নিয়ে গিয়েছিলেন। নজরুল আমায় তাই বলেছিল। তিনি পেন্সিলের লেখা যে দেখেছিলেন সে কথা ঠিকই। আবার কোনো এক কাগজে (আমি নিজে পড়িনি) শ্রী নলিনীকান্ত সরকার নাকি লিখেছিনে যে 'বিদ্রোহী' কবিতা 'বিজলী'তে ছাপানোর জন্যে তিনিই নজরুলের নিকট হতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে নিয়েছিলেন তো অবিনাশ বাবুই.....।" (মুজফ্ফর আহমদ, পৃ. ১২২-১২৪)

মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন শ্রী নলিনীকান্ত সরকার নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং 'বিজলী'তে কর্মরত ছিলেন। মুজাফ্ফর আহমদ মনে করেন যে স্মৃতি বিভ্রমেই এমনটি হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার

জনপ্রিয়তা এতদূর বেড়েছিল যে ১৩২৮ সালের বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' ও অন্যান্য পত্রিকা 'বিজলী' হতেই 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আপন আপন কাগজে উদ্ধৃত করেছিলেন। কবিতাটি 'মোসলেস ভারত' হতে উদ্ধৃত হয়েছে এ কথা 'বিজলী'তে লেখার কারণে অন্য কাগজেরাও তাই লিখেছেন। এ কথা মুজফ্ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মুজাফ্ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থ আরো উল্লেখ করেন, 'বিদ্রোহী' ছাপা হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ হবার বিষয়টিও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন এবং নজরুলের মুখে শুনেই লিখেছেন। তাতে আছে, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে পড়ে শোনানোর পরে তিনি নজরুলকে বুকে চেপে ধরেছিলেন। নজরুল আমাকে এই খবর দেয়নি। তবে আমাকে কথাটা না বলার কারণ হয়তো এই ছিল যে আমি তার কবিতার প্রথম শ্রোতা হয়েও কোনো আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করি নি। অবিনাশ লিখেছেন ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে নজরুল নীচে থেকেই 'গুরুজী' 'গুরুজী' বলে চেঁচিয়েছিল। অবিনাশ বাবু হয়তো ভুল বুঝেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে কেউ 'গুরুজী' ডাকতেন না, ডাকতেন 'গুরুদেব'।" (মুজফফ্ফ আহমদ, পৃ. ১২৪)

উপরোক্ত বিবরণে নজরুল সম্বন্ধে যে তথ্য ভুল ছিল মুজাফ্ফর আহমদ তা সঠিক করে দিয়েছিলেন। তা না হলে নজরুল সম্বন্ধে নানা বিভ্রান্ত সৃষ্টি হতে পারতো।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার অনেক আগেই মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' প্রকাশিত হয়েছিল এবং মোহিতলাল নিজেই সে কবিতা নজরুলকে শুনিয়েছিলেন। কবিতাটি প্রকাশের পর সুধী ও সাহিত্যিক মহলে যে আলোড়োন এসেছিল তা খুবই সীমিত। কিন্তু নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পর সবমহলে যে আলোড়ন এসেছিল তা তুলনাবিহীন। আজ পর্যন্ত এ আলোড়ন থেমে যায়নি।

কেবল গোঁড়া মুসলমানদের একটা অংশ কবিতাটির অর্থ ও মন্তব্য না বুঝতে পেরে তাঁকে 'কাফের' বলে মন্তব্য করতে দ্বিধা করেনি। এ দুর্ভাগ্য নজরুলের নয়, এই দুর্ভাগ্য কবি গোলাম মোস্তফার মতো কিছু মানুষের। এরা নজরুলকে চিত্রিত করেন তাদের ক্ষুদ্রত্ব নিয়ে। কবি গোলাম মোস্তফা নজরুল সম্বন্ধে বলেলেন :

কবি নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছিলাম
ভায়া লাফ দেয় তিন হাত
হেসে গান গায় দিন রাত
প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয়
ধরায় পর তার কেউ নয়।

নজরুল ও মোহিতলাল প্রসঙ্গ ঃ মুজফফর আহমদ ও আজহারউদ্দীন খান

আজহারউদ্দীন খান বাংলা সাহিত্য নজরুল গ্রন্থে বলেছেন: নজরুল প্রকৃতি জানতে হলে গোলাম মোস্তফার ছড়াই যথেষ্ট। আজহারউদ্দীন খান নজরুলকে নিয়ে লেখা

গোলাম মোস্তাফার ব্যঙ্গ কবিতা বুঝেছিলেন কিনা জানিনা। তবে এটিই নজরুলের প্রকৃতি নয়। তাঁর ভেতরের কাঁদনকে ঢাকতে গিয়ে তাঁকে সব সময় হাসি খুশী থাকতে হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর দারিদ্র তাঁকে এবং তাঁর পারিবারকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলেছিল। সে কারণে তাঁকে বিদেশী রেলওয়ে গার্ড সাহেবের বাড়ীতে চাকুরী এবং হোটেলের 'বয়' হতে হয়েছিল। সংসারের খরচ চালানোর জন্য স্কুলের বৃত্তির ৭ টাকা সম্পূর্ণ ভাবেই ছোট ভায়ের হাতে তুলে দিতে হয়েছিল। অত:পর সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে 'মা'কে তার বাবার এক সম্পর্কের ভায়ের সাথে বিয়ে করতে দেখে মায়ের কাছে নজরুল আজীবন ফিরে গেলেন না। এর একটি বড় কারণ এই হতে পারে যে নজরুল চিরকাল দারুণ অভিমানী ছিলেন। ছেলেরা সাধারণত মাকেই অধিক ভালবেসে থাকে। বাবার পরে না অন্যকারো হয়ে যাক, এমনকি কোন ছেলেই চায় না। শেকসপীয়রের লেখা 'হ্যামলেই' নাইকে হ্যামলেটের যে অবস্থা, নজরুলের একখানি না হলেও, কিছুটাতো অবশ্যই হয়েছিল। ভেতরে সব দুঃখকে চেপে ধরে তিনি মাকে তাঁর অভিমানেই ঝলসিয়ে দিতে চাইলেন, অন্যকে 'মা' বলে। যারা তার মা হয়েছিলেন নজরুল তাঁদের মধ্যেই নিজের মাকে খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন। বস্তুত, বাইরে থেকেই আমরা তাকে দেখেছি, ভিতরের দিক অনেকেই তলিয়ে দেখতে চাইনি।

নজরুল চিরকাল ভালবাসা ও স্নেহের কাঙ্গাল ছিলেন। শৈলজানন্দ তাঁর 'কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে' গ্রন্থে তার বিবরণ দিয়েছেন।

মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তার সম্পর্কেও অবনতিও ঘটে এই আবেগজনিত কারণে। মোহিতলাল নিজেও এ জন্যে দায়ী ছিলেন। তিনি নজরুলের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলেন। 'আমি' ও 'বিদ্রোহী' কবিতায় সাদৃশ্য হয়তো কোথাও থাকতে পারে; কিন্তু দুটি কবিতা দুটি প্রেক্ষাপটেই লেখা। এ বিষয়ে শ্রী রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া যায়ঃ

"মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' (জীবন জিজ্ঞাসার অন্তর্গত) প্রবন্ধের ভাববস্তুর সঙ্গে নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী কবিতাটির সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কবিতার রচনার বেশ কয়েক বছর আগে মোহিতলালের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। মোহিতলাল মনে করেন তাঁর রচনাকেই নজরুল আত্মসাৎ করেছেন, অথচ কোথাও তার উল্লেখমাত্র নেই। বলাবহুল্য, "আমি" প্রবন্ধের বীজ ক্ষেত্রমোহন বন্দোপাধ্যায়ের যে গ্রন্থটি থেকে গৃহীত, আধ্যাত্মিক রূপকার্থের মূল্যেই সেটি উল্লেখ্য, সাহিত্য গুণে নয়। পরন্তু নজরুলের কবিতাটি যে একান্ত আত্মগত প্রেরণার ফল তা কাব্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। নতুবা রবীন্দ্রপ্রতিভা যখন মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে বিরাজমান, তখনই নজরুলের আকস্মিক আবির্ভাব দলগোষ্ঠী নির্বিশেষে এমন সম্বর্ধিত হত না।" (নীলকণ্ঠ, কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিংশ শতাব্দী, শ্রাবণ, ১৩৭১)

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে নজরুলের 'বিদ্রোহী'র সুর, ভাষা এবং ভাবের সঙ্গে মোহিতলালের 'আমি'র কোন মিল পাওয়া যায় না। মোহিত লাল 'আমি' বলার উৎসকেও কোথাও উল্লেখ করেননি এটা পুরোপুরি তাঁর নিজস্বও ছিল না।

মোহিতলাল অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'অভয়ের কথা' থেকে তাঁর প্রবন্ধের 'বীজ' চয়ন করেছেন। কিন্তু তাঁর নিবন্ধের কোথাও তার উল্লেখ নেই। নজরুলের 'বিদ্রোহী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ একক এবং অনন্য কবিতা। মোহিতলাল মজুমদার এ বিষয়ে নজরুলকে নানাভাবে তিরস্কার করেছেন এবং তাঁর ভাষা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ। অতঃপর তিনি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে যুক্ত হন।

সজনীকান্ত দাস নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাকে ব্যঙ্গ করে 'ব্যাঙ' নামে একটি প্যারোডি কবিতা লিখে ফেললেনঃ

'আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই
আমি বুক দিয় হাঁটি ইদুঁর ছুচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই!
আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনী দলিত ফণা,
আমি ছোবল মারিলে পরের আয়ু মিনিটে যে যায় গণা
আমি নাগশিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি
আমি 'বে অব বিস্কে 'সাইক্লোন' আমি মরু সাহারার আঁধি!
আমি খোদার ষণ্ড, নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর হানি।

নজরুলের 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতাটিকেও ব্যঙ্গ করে সজনীকান্ত দাস লিখেছেনঃ

"চোর ও ছ্যাঁচোর, ছিঁচকে সিঁধেলে দুনিয়া চমৎকার--
তথাপি তলপা তহবিল নিয়ে ভাণ্ডারি হুশিয়ার!"

কিন্তু এ সবের দ্বারা নজরুলের জনপ্রিয়তা কমলো তো নয়ই, বরং শত সহস্র গুণে নজরুল মানুষের মণিকোঠায় স্থান করে নিলেন। 'বিদ্রোহী'র নানা সংস্করণই তা প্রমাণ করে।

মোহিতলাল 'বিদ্রোহী' কবিতার সমালোচনা করে লিখেছেনঃ

"মানবাত্মার পক্ষে গ্লানিকর একশ্রেণীর ভাব ও ভাবুকতা বিদ্রোহের 'রক্ত-নিশান' উড়াইয়া ভয়ানক আস্ফালন করিতেছে। এ বিদ্রোহের মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাবল্য নেই, মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী অভ্যুত্থান কামনা নাই.....নিছক বিদ্রোহ ভালই জমিয়াছে।" আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকের বালক প্রতিভা কাব্যকাননে কামকন্টক ব্রণ মহুয়া 'কুঁড়ি'র চাষ আরম্ভ করিয়াছে।...." (মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম পৃ. ৭০-৭১)

মোহিতলাল নজরুলের ওপর এতই ক্রুদ্ধ হন যে তিনি নজরুলের সমস্ত কবিতাকেই নিন্দা করে বেনামীতে 'চামার খায় আম' নামে লিখেছেনঃ

চাহিনা আঙ্গুর–শুধু চানাচুর
কাঁকড়ার ঠ্যাং খান দুই,-
খসখসে ফুল নিয়ে আয় সখি,
চাইনা গোলাপ, বেল যুঁই!
লোকে বলে গানে আঁশটে গন্ধ
বোঝেনা আমার এমন ছন্দ!

এমন বহু ব্যঙ্গ কবিতা লিখে নজরুল প্রতিভাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়েছে। কাল তার জবাব দিয়েছে। নজরুল বহাল তবিয়তে জনমন নন্দিত হয়েই আছেন। অবশ্য নজরুল এসব সমালোচনায় একেবারে চুপ থাকেন নি। তিনি মার্জিত ভাষায় এককালের সুহৃদ মোহিতলাল মজুমদারকে নিয়ে লিখেছেন 'সর্বনাশের ঘন্টা'। এখানে তার সামান্য কয়েকটি লাইনের উদ্বৃতি দেওয়া হলঃ

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির–নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেষা!
হে দ্রোণাচার্য! আজি এই নব জয়যাত্রার আগে
দ্বেষা পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
শিষ্য তোমার, দাও গুরু দাও তব রূপ-মসী ছানি
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিৎ কদর্যতার গ্লানি!
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদ্গার গুরু শিষ্যের শিরে; তব বুক হোক খালি!

নজরুলের ওপর মোহিতলাল মজুমদারের আক্রোশ এবং ক্ষোভ; অতঃপর শনিবারের চিঠিতে ক্রমান্বয়ে নজরুলের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রুপের কারণে নজরুলের চেয়ে নজরুল বন্ধুবান্ধব আরো বেশি মর্মাহত হন। তাঁরা নজরুলের প্রতিভাকে আরও বিকশিত করার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা নিতেন। নজরুল ছিলেন তাঁদের আবিষ্কার। বিশেষ করে অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার নজরুলের একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁরাই মোহিতলালের আচরণে অত্যাধিক ক্ষুব্ধ হন। অতঃপর কল্লোল অফিসে নজরুলকে বসিয়ে তাঁরা মোহিতলালের বিরুদ্ধে নজরুলকে দিয়ে 'সর্বনাশের ঘন্টা' লিখিয়েছিলেন। নজরুল মার্জিতভাবেই মোহিতলাল মজুমদারকে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কবিতাটি ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যক 'কল্লোলে' ছাপা হয়েছিল। নজরুলের 'ফণিমনসা' গ্রন্থে এই কবিতা 'সাবধানী ঘন্টা' নামে ছাপা হয়েছে। এই কবিতার জবাবে মোহিতলাল 'দ্রোণ-গুরু' নামে কবিতা লিখেছিলেন। শনিবারর চিঠিতে তা ছাপা হয়েছিল। 'দ্রোণ-গুরু'তে মোহিতলাল অমার্জিত এবং অতি কুৎসিত ভাষায় নজরুলকে আক্রমণ করলেন। তাঁর কবিতার সেই ভাষা যে কত নিবমানের ও বিদ্বেষপ্রসূত হতে পারে তার কিছু নমুনা নিবে দেওয়া হলঃ

ওরে নিঘৃণ! আপনি আপন বিষ্ঠার পর্বতে
চড়ি' বসিয়াছ––মনে করিয়াছ আঁধারিকে হেন মতে
সবিতার মুখ! মোর যশো-রবি-রাহু হতে সাধ যায়!
আরে, আরে তোর স্পর্দ্ধায় দেখি জোনাকিও লাজ পায়!
কেমনে আনিলি হেন কথা মুখে? যজ্ঞের হবিটুকু
সন্তর্পণে রাখিয়াছি ঢেকে, তাও হেরি চাকু-চুকু
করিয়া লেহন, সাধ যায়––সেথা উগারিতে একরাশি
অমেধ্য যে সব উদরে রাজিছে––কতকালকার বাসি,
চুরি করা যত গরহজমের!–পথে প্রান্তরে যার
সৌরভ পেয়ে এতদিন পরে ভরিয়াছে সংসার
লালা ও পঙ্ক বিলাসীর দল––শবভুক নিশাচর,
শকুনি, গৃধিনী, শৃগালের পাল––রসনা-তৃপ্তিকর
পাইয়াছে ভোজ! ভাবিয়াছ বুঝি সেই রস উপাদেয়?
দেব-যজ্ঞের আহুতি সে ঘৃত সোমরস হবে হেয়?
উন্মাদ–তুই উন্মাদ! তাই পতনের কালে আজ
বিষ-বিদ্বেষ উথলি' উঠেছে, নাই তোর ভয় লাজ!
.....
আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর––
অধঃপতনের দেরী নাই আর, ওরে হীন জাতি চোর!

মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেনঃ

"১৬২ ছত্রের এই বিরাট কবিতাটি হতে সজনীকান্ত মাত্র দশটি ছত্র তাঁর 'আত্মস্মৃতির' প্রথম খণ্ডে (১৬১ পৃষ্ঠা) উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই নিদারুণ কবিতার শেষ কয়েক পংক্তি মারাত্মক, বাংলা সাহিত্যে অভিশাপের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।"

নজরুল ইসলাম মহাভারত হতে উপমা দিয়ে তাঁর 'সর্বনাশের ঘন্টা' শুরু করেছে। সে-ই প্রথম মোহিতলালকে বলেছেন দ্রোণাচার্য্য, আর নিজেকে বলেছে তাঁর শিষ্য। মোহিতলাল সেই ভাষাতেই অর্থাৎ নিজে 'দ্রোণ-গুরু' হয়ে নজরুলের কবিতার জবাব দিয়েছেন এবং তাতে সজনীকান্তকে বানিয়েছেন অর্জুন। তার জন্যে মোহিতলালকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু পাশাপাশি দু'টি কবিতা পড়লে সকলে দেখতে পাবেন যে নজরুল সম্ভ্রমের সঙ্গে তার কবিতাটি আরম্ভ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সংযম বজায় রাখার চেষ্টাও সে করেছে। হয়তো 'ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার' জাতীয় কথাগুলি না বললেই ভালো হতো। কিন্তু অসহিষ্ণু ও দাম্ভিক মোহিতলাল সংযমের কোন বাঁধনের তোয়াক্কাই করেননি। তার মনে যা এসেছে তাই তিনি লিখেছেন

তাঁর কবিতায়। নজরুলকে তিনি বলেছেন, 'হীনজাতি চোর' যাঁরা নজরুলকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন, তাদের তিনি বলেছেন, 'মর্কট' ও 'ইতর', আর জনগণ তাঁর নিকটে গড্ডালিকা।" (মুজফ্ফর আহমদ, প্রাগুক্ত)

মুজফ্ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে নজরুল ও মোহিতলাল সম্পর্কে বিস্তরিত লিখেছেন। তিনি অনেক তথ্য দিয়েছেন যা সঠিক।

এই আলোচনার একটি পর্যায়ে তিনি আজহারউদ্দীন খানের 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' ও 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল' প্রবন্ধের সমালোচনা করেছেন এবং অনেক তথ্যের ভুলও নির্ধারণ করেছেন। আজহারউদ্দীন খান তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে নজরুল প্রশস্তিকে সমালোচনা করেছেন। কথাটি নজরুল সম্বন্ধে যেমন সত্য, তেমনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও কম সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ভক্তবৃন্দ দেবতারূপে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু নজরুল ভক্তবৃন্দ তাঁর মানবতাবোধকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

অবশ্য এটা বলা যেতে পারে, পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্বপাকিস্তানে নজরুলকে সে সময় ভিন্নমাত্রায় দেখতে চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি মুসলমান হওয়ায় তাঁর প্রতি সম্মানের বোঝাটাও অনেক বেশী ছিল, আজহারউদ্দীন খান তা বলেছেন। পূর্বপাকিস্তানে একদল মুসলমান সাহিত্যিকে যেমন তাঁকে 'কাফের, শয়তান' নাম দিয়েছেন। আবার তাঁদের মধ্য থেকেও একটি দল নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তুলনীয় দেখতে রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুলকে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দিয়েছেন। এটা যে সঠিক ছিল না আজহারউদ্দীন খান তা বলেছেন। এটা যাঁরা করেছিলেন তারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। নজরুল চিরকাল অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানে তাঁকে 'মুসলমান কবি' হিসেবে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। নজরুল নিঃসন্দেহে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নন এবং এমন দাবি স্বয়ং নজরুলও কখনও করেননি। তবে নজরুলের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর কাব্যের নূতনত্ব নিয়ে। ইংরেজী সাহিত্যে অনেক বড় বড় কবি জন্ম নিয়েছেন। একযুগ থেকে আর এক যুগের কবি অন্য ভাব-ভাষায় কবিতা লিখেছেন। কিন্তু গোটা ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে শেক্সপীয়র একজন অনন্য–সাধারণ লেখক। তাঁর প্রতিভার সঙ্গে অন্যের তুলনা করা যায় না। তবে নতুনেরা কাব্য জগতে যে 'নূতনত্ব' এনেছিলেন তা নিয়ে শেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনা করাও নিতান্ত অসঙ্গত। মিল্টন তাঁর যুগে এমনি এক অসাধারণ কবি ছিলেন। তাঁর প্যারাডাইস লস্ট Paradise lost এবং Paradise Regained নিঃসন্দেহে–তার ঐশ্বর্য, বর্ণবিন্যাসে এবং রচনাশৈলীতে অনুপম এবং অতুলনীয়। ডব্লু বি ইয়েটস, এজরা পাউণ্ড এবং টি এস, এলিয়ট আধুনিক যুগের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। এরা তিনজনেই তাঁদের নিজস্ব ভুবনে শ্রেষ্ঠ হয়ে রয়েছেন। এদের পরে যাঁরা কবিতা লিখছেন এবং পোয়েট লরিয়েট হয়েছেন, যেমন 'টেড হিউজ'––তিনি তাঁর নিজস্বজগতে শ্রেষ্ঠ হয়ে রয়েছেন। ফিলিপ লারকিনকেও পোয়েট লরিয়েট-এর সম্মান দেওয়া হয়েছিল তাঁর

কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। তাই বলে তাঁর কবিতা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাটিতে দাঁড়াতে পারে নি এমন নয়। সীমাস হীনে আর এ অসাধারণ কবি। এদের সকলের লেখায় আধুনিক বিশ্ব এবং জীবন প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সেটা আমাদের গর্ব। তাঁর কবিতার মান বিশ্বসাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই বলে নজরুল তাঁর থেকে অনেক নিম্নমানের কবি অথবা তিনি 'যথার্থ' কবি হতে পারেননি বলে যাঁরা আত্মশ্লাঘায় ভোগেন, তাঁদের ভেতরে যে একটা হীনমন্যতা কাজ করে সেটিই প্রকট হয়ে পড়ে। একজন কবি তাঁর নিজস্ব লেখার ধরণ নিয়েই বিচার্য হয়ে থাকেন। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন এক অবিনাশী প্রতিভাবান কবি। তাঁর কাব্য এবং নাটক ইত্যাদিতে তিনি অনন্য। এখানে বলা প্রয়োজন যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া বা না পাওয়ার মধ্যে একজনের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত থাকে না।

নজরুলের প্রতিভা আদৌ রাবিন্দ্রীক নয়। জীবনানন্দ দাশ তাঁর নিজস্ব কাব্য সুষমা নিয়ে যে জীবন নির্মাণ করতে চেয়েছেন সেখানেও তিনি 'অনন্য'। তাঁর কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত রয়েছে। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্র কেউই রবীন্দ্রবলয়ে বিচরণ করেন নি। তবে এসব আধুনিক কবিদের রচনায় নজরুল যে জীবনকে তুলে ধরেছেন তাদের কাব্যে ভিন্ন মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে।

নজরুল যে কবিতা লিখেছেন তা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই। কখনও তিনি হিন্দুর জন্যে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছেন যা তাঁকে হিন্দুদের নিকট প্রিয় করে তুলেছে। আবার যখন মুসলমানদের জন্য ইসলামী সংগীত লিখেছেন তাতে মুসলমানেরা খুশী হয়েছেন। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ, যেমন তাঁর হিন্দুত্ব 'বিসর্জন' দেননি এবং তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে হিন্দুদের প্রতি তাঁর মমত্ব যদি বেশী থাকে তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তেমনিভাবে হিন্দুধর্ম বা দর্শন অপেক্ষা নজরুলের কাব্যে ইসলাম বা মুসলিমদর্শন যদি কোথাও বেশী থাকে তাতে তাঁকে অবমূল্যায়ন করাটাও ঠিক হবে না। সেটা দোষের, তা হলো নজরুল যা লিখেছেন তাতে যদি হিন্দুয়ানী শব্দ ইত্যাদি থেকে থাকে তা কেটে তাতে মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করতে হবে, এমন যাঁরা ভাবেন, তাঁরা আর যাই হোন না কেন সাহিত্যজগতে তাঁদের স্থান আদৌ থাকা উচিৎ নয়। পূর্বপাকিস্তানে একশ্রেণীর পণ্ডিত এমনটি করেছেন। কাঁদের ভাবা উচিৎ ভাষা আল্লাহর সৃষ্টি। এটা কোন সম্প্রদায়ের হতে পারে না। যেমন ইংরেজী ভাষা কেবল ইংরেজদের নয়। এখন এটা গোটা বিশ্বের। বাংলা ভাষা হিন্দু, মুসলমান উভয়ের। এই ভাষায় গড়ে উঠেছে স্ব স্ব ধর্মের সংস্কৃতি। কিন্তু কাউকে আঘাত করেনি।

এ প্রসঙ্গে আজহারউদ্দীন খান বলেনঃ "আজ আমার আতঙ্কিত হবার সবচেয়ে বড় কারণ যে নজরুলের বন্ধুস্থানীয় মুসলিম অনুরাগী কয়েকজন কবি সম্পর্কে কয়েকটি জীবনী লিখতে গিয়ে কবিকে মুসলিম প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে তাঁর বিবাহাদি, ছেলের

অন্নপ্রাশন ইত্যাদি হালকা বিষয়গুলিকে যার বিস্তৃত উল্লেখ জীবনী রচনায় অপরিহার্য নয় তাকে অযথা মুসলিম ছাঁচে ঢেলে দেখানো হচ্ছে যে কবি প্রথম থেকে ইসলামের একজন খিদমতগার, দেব-দেবীর যে গুণকীর্তন তা তাঁর সাময়িক চিত্তবিক্ষেপ। হিন্দু মহিলাকেও বিয়ে করলেও তিনি তাঁকে ইসলামিক ছাঁচে গড়ে নিয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের মতন একজন মহান কবি, তাঁর মতন বিরাট জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাকে যা কাব্য আস্বাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নয় সবকিছু জড়িয়ে নিয়ে এক বিরাট পুরুষ হিসেবে খাড়া করার এমন এক বিশ্রি প্রয়াস করেছেন যে কবি সুস্থ থাকলে প্রতিবাদ তাঁকেই করতে হত--আজ তিনি অসুস্থ, ঐ মন্তব্যের কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করে না। কবির আত্মীয়স্বজনকে প্রতিবাদ করতে অনুরোধ জানাই।

আমি তাঁর জীবনী সম্পর্কে কোন কিছু বলতে পারব না কারণ আমি সে সময়কার লোক নই কিন্তু তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে যে মন্তব্য একটি দেশে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে কঠোর প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এতকাল আমি এ সম্পর্কে নিশ্চুপ ছিলাম কারণ নিজেই ভেবেছি বিরুদ্ধ পক্ষের অভিমতকে প্রাধান্য দেবার অর্থই হলো যে অহেতুক তাদের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়া। আজ দেখছি সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। আমার উষ্মার প্রধান কারণ হচ্ছে যে কবির সৃষ্টিকে পর্যন্ত বিকৃত করা হচ্ছে। নিজেদের খেয়াল ও স্বার্থমাফিক কবির রচনার শব্দকে পরিবর্তন করে নিজেদের অভিমতকে দৃঢ় করছেন। যেমন চল্ চল্ চল্ গানে আছে-

নবজীবনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
চলরে নৌ-জোয়ান
শোনরে পাতিয়া কান-
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।

এই লাইনগুলো তাদের হাতে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে নিবরূপে-

তাজা-ব তাজার গাহিয়া গান
সজীব করিব গোরস্থান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল
চলরে নও-জোয়ান
শোনরে পাতিয়া কান-
নয়াজামানার মিনারে মিনারে
জীবনের আহ্বান।

এই জাতীয় পরিবর্তনে সেই দেশের সরকারের সমর্থন রয়েছে এবং উক্ত উদ্ধৃতি সরকারি প্রকাশনা থেকেই তোলা হয়েছে। কবির রচনার যদি এইভাবে বিকৃত করার অবাধ স্বাধীনতা অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে তাহলে আমাদের উত্তর-পুরুষ এক মহাসমস্যার মধ্যে পড়বে এবং এখনই তো নজরুলের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের এক সংস্করণের সঙ্গে অন্য সংস্করণের লাইন ও যতিচিহ্নগত অমিল দেখা যাচ্ছে। কবির অনুরাগী এবং যাঁরা তাঁর বই প্রকাশ করেন তাঁরা যেন একটু সতর্ক ও সবিশেষ আলোচনা করে গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নেন। আমিইতো মাঝে মাঝে প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হই।" (আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৯৬-৯৭)

আজহারউদ্দীন খানের উপরিউক্ত আলোচনা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। যাঁরা এই কাজটি করেছেন তাঁরা নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্থলে চরমভাবে অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। এমন কর্ম নিঃসন্দেহে ক্ষমার অযোগ্য।

কিন্তু এসবের পরিপ্রেক্ষিতে আরো যে সব কথা তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয় এবং অনেকক্ষেত্রে নজরুলকে অবমূল্যায়নের অপচেষ্টা।

ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের একটি বিবরণে উল্লেখ রয়েছেঃ

নজরুল ইসলাম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যে সাহিত্যিক রূপ দিলেন এবং ইসলাম ধর্মের যে গভীর মর্মবাণী উদ্‌ঘাটিত করিলেন, তাহাতে বাংলার মুসলমানের চোখ খুলিয়া গেল, হৃদয়ে জাতি হিসাবে বাঁচিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। দেশের স্বাধীনতায় ইহার ফল যে-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায়ও তাহা রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই দিক হইতে নজরুল ইসলামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বাধ্য হইয়াই বলিতে হয়, তিনিই বাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বাপ্নিক। (মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ. ৩৮)

উপরিউক্ত বিবরণে ড. মুহম্মদ এনামুল হক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় নজরুল ইসলামের কবিতা ও সাহিত্য যে প্রেরণা দিয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন। এটা সঠিক নয়। নজরুল গোটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা ভেবেছিলেন। এই ভারতবর্ষ হবে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের। পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের তিনি জাগাতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমানদের কথাও তিনি বলেছেন। নজরুলকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বাপ্নিক বলা হলে তাকে নিঃসন্দেহে অবমূল্যায়ন করা হবে।

এখানে উল্লেখ করা অসঙ্গত নয় যে তৎকালীন ভারতে মুসলমানদের অবস্থা আদৌ ভাল ছিলনা। বৃটিশ ভারতে হিন্দু সম্প্রদায় বৃটিশদের কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করতেন। শুধু তাই নয়, মুসলমানদেরকে তাঁরা অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন নামেও অভিহিত করতেন। মুসলমানদের সাথে কোন সম্পর্ক তাঁরা রাখতে চাইতেন না। কদাচ কোন মুসলমান তাদের বাড়ীতে গিয়ে চলে আসবার সময় তার সম্মুখেই গোবরজল কিংবা গঙ্গাজল দিয়ে তার দাঁড়ানো কিংবা বসবার জায়গাকে পবিত্র করা হতো। তৎকালীন বাংলাদেশে এ অবস্থা সর্বত্রই বিরাজ করতো। আমি নিজেও আমার গ্রামে এমন হতে দেখেছি। গ্রামে-

গঞ্জে হিন্দুদেরকে 'বাবু' নামে সম্বোধন করতে হতো এবং তারা মুসলমানদের ছোটভাবে দেখতেন। অশিক্ষিত মুসলমানদের তারা আমলে আনতেন না। এসবের জন্য

পাকিস্তান দাবী আদৌ অযৌক্তিক ছিলনা। নজরুলের কবিতা এবং কলকাতায় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা তৎকালীন মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির প্রেরণা দিয়েছে। আমাদের একথা অবশ্যই মানতে হবে যে মুসলমানেরাই ধর্মীয়গতভাবে অসাম্প্রদায়িক। ইসলাম তাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। ধর্মগতভাবে মুসলমান একেশ্বরবাদী কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী। হিন্দুদের কাছে ভারতভূমি 'Mother-goddess' (দুর্গা বা কালীর প্রতীক) হিসেবে গণ্য হয়েছে। এ জন্যই সে সময় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারিত হতো। হিন্দু সম্প্রদায়ও তখন দ্বিজাতিতত্ত্বতে বিশ্বাসী ছিল। কোন মুসলমান তাই বন্দেমাতরমকে গ্রহণ করতে পারে না। কোন মুসলমান এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে প্রভু এবং জীবন মরণের দণ্ডদাতা বলে মানতেও পারে না। ড. এনামুল হক সে সময়ে মুসলমানদের অবস্থা বিশ্লেষণ করেই নজরুলকে বাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একজন স্বাপ্নিক বলে অভিহিত করেছেন। এই উক্তি নিঃসন্দেহে অতিশয় উক্তি এবং যথার্থ নয়। কিন্তু সমকালীন সমাজে মুসলমানদের বেঁচে থাকার একটা প্রেরণা হিসেবেই নজরুলকে গ্রহণ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সর্বক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন না। 'শিবাজী উৎসব' তাঁরই রচনা। বৃটিশ বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই বাধা দিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁর সমগ্র রচনা বিশ্লেষণ করলে তা মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি থেকে স্বতন্ত্র বলেই গ্রহণ করতে হবে। তিনি তাঁর রচনায় ভারতমাতা/বঙ্গমাতার জয়গান গেয়েছেন। এতদসত্ত্বেও একথা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে নজরুল শুধু যে মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছেন তা নয়, তাঁর সমগ্র রচনা অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায় তথা হিন্দু ধর্ম ও জাতিকে নিয়েও লেখা।

নজরুলের 'শ্যামাসঙ্গীত' হিন্দুদের মনকে তৃপ্তি দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু হিন্দুধর্মের অনেক মানুষের অন্তরকে নজরুল জয় করতে পারেন নি। হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করার পরেও তিনি তাদের 'জাতে' উঠতে সক্ষম হননি। মুসলমান হিসেবে তাঁর প্রতি বৈরী আচরণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় বহরমপুরে ড. নলীনাক্ষ সান্যালের বিবাহে বরযাত্রী বন্ধুবান্ধবেরা নজরুলকে নিয়ে বিবাহ আসরে উপস্থিত হলে গোঁড়া হিন্দুরা বিবাহ আসর ত্যাগ করেন। কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে নজরুলের বন্ধুত্ব ছিল অত্যন্ত গভীর। কিন্তু তাঁর পরিবারে একটি বিবাহ বাসরে নজরুলের উপস্থিতি গোঁড়া হিন্দুরা মেনে নেন নি। এ জন্যে নজরুল লিখলেন, 'জাতের নাম বজ্জাতি সব' (পুরো কবিতা যাবে)

তবে আজহারউদ্দীন ০৮/০৫/৫৭ তারিখে দেওয়া ড. এনামুল হকের বেতার কথিকায় রবীন্দ্র বিরোধী বক্তব্যের যে সমালোচনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে সঠিক এবং যথার্থ। জোর করে নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের থেকে বড় করে তুলবার এ এক অসাধু অপপ্রচেষ্টা।

আজহারউদ্দীন খান তাঁর গ্রন্থে খান মুহম্মদ মঈনউদ্দীন বিরচিত যুগস্রষ্ঠা নজরুল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন নিবরূপেঃ

"নজরুল সম্ভবত একমাত্র কবি, যিনি এদেশের হিন্দু মুসলমান দুই বৃহৎজাতিকে বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন।.....তাই তিনি সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পেরেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বোধ হয় একক। বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র এমনকি রবীন্দ্রনাথও সাহিত্য ক্ষেত্রে সবসময় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি।"

উপরিউক্ত বিবরণ নিঃসন্দেহে যথার্থ। কিন্তু আজহারউদ্দীন খান তা স্বীকার করতে চাননি। কেন চাননি তা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ নেই। নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতা তাঁর চরম শত্রুও স্বীকার করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর উপন্যাস, প্রবন্ধে তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন না। তবে তাঁর উপন্যাস 'শ্রীকান্তে' একটি ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে এমন বলা হয়েছে যে, এখানে বাঙ্গালী ও মুসলমানদের মধ্যে খেলা হচ্ছে। সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানকে সংক্ষিপ্তকারে 'ইসলামী সাহিত্য' বলেছেন।

মুসলমানেরা বাংলাদেশে যে বিজাতীয়, হিন্দু লেখকদের এমন বক্তব্য অনেক গ্রন্থেই প্রকাশ পেয়েছে। এখানে গোপাল হালদার লিখিত 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থেও বাংলাদেশের মুসলমানদের স্বদেশ হিসাবে 'মক্কা'কে বুঝানো হয়েছে এবং দৈনিক পাঁচবার সেদিকে মাথানত করে মুসলমানেরা তাঁদের স্বদেশভূমিকে স্মরণ করেন, এমন উক্তিও করা হয়েছে। (গোপাল হালদার, ইসলামের স্বাতন্ত্র, 'সংস্কৃতির রূপান্তর')

রবীন্দ্রনাথ নজরুলের মতো প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত ছিলেন না। তাঁর কাব্য-সাহিত্যে এর প্রতিফলনও দেখা যায় না। বাংলাদেশে অবস্থানকালে তিনি শিলাইদহ ও পতিসরে হিন্দু স্বজাতিদের জন্য উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড করেছেন। মুসলমান প্রজারা তাঁর বিরোধিতা করেন নি বরং রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়নে তাঁরা তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাকিস্তানে সরকারিভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাব সক্রিয় ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কখনও ছোট করে দেখেননি এবং নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা একজন বড় কবি হিসেবে গ্রহণ করেনি। তবে নজরুলের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে নূতন পথের সন্ধান পেয়েছে এমন বিশ্বাস তাদের হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি রবীন্দ্র - বিরোধিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

সে-সময় পূর্বপাকিস্তানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নজরুলের গানের ভাষা যেমন পরিবর্তন করা হয়েছে তেমনি শোনা যায়, সরকারিভাবে কিছু কিছু বুদ্ধিজীবিকে দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মত সঙ্গীত রচনার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। এসব করে সে সময়ের সরকার ও কতিপয় বুদ্ধিজীবি ইসলামকেই ক্ষতিই করেছিলেন। সুতরাং বলা যেতে পারে

এসব বুদ্ধিজীবি এবং সাহিত্যিকেরা একদিকে যেমন নজরুলকে মুসলমান কবি বানাতে গিয়ে নিজেদেরকে হাস্যাস্পদ করেছেন অপরদিকে রবীন্দ্রনাথকে পূর্বপাকিস্তানের সংস্কৃতির বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অন্যদের আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এখানে বলা প্রয়োজন, নজরুল বাংলা সাহিত্যে আপন মহিমা নিয়ে আবির্ভুত হয়েছিলেন। আজহারউদ্দীন খান বলেছেনঃ "নজরুল যখন বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশয় প্রভাব সমস্ত সাহিত্যিক চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। যুদ্ধ ফেরৎ নজরুল নিয়ে এলেন সৈনিকজীবনের অভিজ্ঞতা। জীবনানুভূতি স্বতন্ত্র হওয়ায় তাঁর প্রকাশরীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াবার জন্যে তাঁকে বিশশতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের কবিদের মত সজ্ঞানকৃত চেষ্টা করতে হয়নি, কারণ যাঁরা সেদিন সজ্ঞানকৃত চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল কম, বেশি ছিল পড়াশুনাজনিত বিদ্যাবত্তা। অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ঐসব বাংলা কবিতা ইংরেজি সাহিত্যের ধার করা পোষাক।

কিন্তু নজরুল জীবনকে দেখেছেন, মানুষকে দেখেছেন, আঘাত খেয়েছেন, আঘাত দিয়েছেন, তাদের সমতলে নেমে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করেছেন, কাজেই অভিজ্ঞতার জোরে অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্যে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হয়েছেন–সেটা জীবনের উন্মাদনার দিকটা যে উন্মাদনা যৌবনের অঙ্গ তাকেই রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছু দূরত্বের সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু প্রেম-প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁর স্বকীয়তা বিদ্রোহীরূপের মত প্রখর নয়। যৌবনের উন্মাদনা সৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি অসামান্য হতে পারেন, সেটা তাঁর কৃতিত্ব হতে পারে, কিন্তু এটির জোরেই তাকে রবীন্দ্রনাথ বানানো যায় না।" (আজহারউদ্দীন পৃ. ৯৯)

আজহারউদ্দীন খান প্রথম দিকে যা বললেন, তা ভালই বললেন। কিন্তু উপরিউক্ত গুণের জন্য জোর করেই নজরুলকে কারা 'রবীন্দ্রনাথ' বলতে চাইলেন তা স্পষ্ট নয়। জোর করে নজরুলকে কেনইবা রবীন্দ্রনাথ হতে হবে? দু'জন দু'ধারার কবি। আজহারউদ্দীন খান রবীন্দ্র অনুরাগী, তা তিনি হোন, আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর এমন আশংকা কেন? নজরুল তো তাঁকে প্রথম থেকেই অনেক উঁচু সম্মানে বসিয়ে এসেছেন। তাঁর নিজের গান গাওয়ার আগে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন তাঁর ভক্তির পরা কাষ্টা দেখিয়ে (দ্র. মুজাফ্ফর আহমদ, স্মৃতিকথা)। নজরুলকে যাঁরা জোর করে রবীন্দ্রনাথ বানাতে চান সেটা তাঁদের অবিমৃষ্যকারিতা। নজরুল নিজেও এমন প্রতিযোগিতায় কখনও নামেননি। তবে নজরুল যে রবীন্দ্রনাথের চাইতে এক নতুন কাব্যরসবোধ সৃষ্টি করেছিলেন আজহারউদ্দীন খানকে তা স্বীকার করতেই হয়েছে।

আজহারউদ্দীন খান রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শঙ্কিত। বোধকরি সে কারণেই তিনি নজরুলের প্রতিভাকে 'তাৎক্ষণিক' আখ্যায়িত করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন বলেছেন যে তিনি কখনও তাৎক্ষণিকের নেশায় মাতেননি। অথচ কালের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ এমন এক সখ্যতা স্থাপন করেছিলেন, মনীষার উদার ক্যানভাসে ভাবনাকে সংযম ও সুষমাভূষিত করেছেন যা বিরাটের ব্যাপ্তি পেয়েছে। কাজেই তার সৃষ্টি সম্ভারে সমগ্র বিংশশতাব্দী, সমগ্র বিশ্বের মর্মকথাটি উদঘটিত। তিনি জীবনবোধের ঋষি, সাহিত্যকলায় তিনি বিশ্বকর্মা, কিন্তু নজরুল ঐ বিরাট যুগের ছোট্ট সময়ের কবি–যে সময়ের শুরু হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে আর শেষ হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এসে। এই অন্তবর্তী সময়ের মধ্যে নজরুল অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। মানুষের উত্তপ্ত হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, সময়ের প্রয়োজনকে তিনি কাব্যে লাগাতে পেরেছিলেন বলেই সে যুগ পরিবেশে তিনি ছিলে প্রগতিশীল যেমন ছিলেন সত্যেন দত্ত।" (আজহারউদ্দীন খান, পৃ. ১০০)

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আজহারউদ্দীন খানের অতিশয়উক্তি প্রয়োজনহীন। কারণ রবীন্দ্র প্রতিভা সম্পর্কে এটা কোন নতুন বিশ্লেষণ নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে নজরুলের কোন মিল নেই। কবিতা, গান, উপন্যাস সর্বক্ষেত্রেই নজরুল রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা। বরং নজরুল যেমন, তাঁকে সেভাবেই চিহ্নিত করাই যথার্থ সমালোকের কাজ।

নজরুল সে সময়ের ভারতবর্ষে দেশবাসীর জন্য যে মুক্তির সনদ এনে দিয়েছিলেন তাকে তো ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। আজহারউদ্দীন খান নিজেও তা বুঝেছিলেন। তাই তিনি বলেনঃ "ভারতবর্ষে একটা অস্থির চাঞ্চল্য যুদ্ধাবসানের ক্লান্ত পরিবেশকে আলোড়িত করে তুলেছে–একটা বিশ্বজোড়া ভাঙনের অরাজক সমাধানে তুষ্ট হতে প্রত্যেকেই ব্যগ্র কারণ একদিকে অর্থনৈতিক সংকট, বেকার বিভ্রাট, প্রাণধারণের উপযোগী দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি, মান্দাতার আমলের ধ্যানধারণার মূল্য পরিবর্তন, অপরদিকে রাশিয়ার জার-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থান ও নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা, মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম রাজ্যের জাগরণ ইত্যাদি একের পর এক ঘটে যাওয়ার ফলে এদেশের বুদ্ধিজীবি মানুষ বিস্ময়বিমূঢ় আর নেতৃবৃন্দ সময়ের চাঞ্চল্যে দ্বিধাজড়িত। এজন্যে দেখি একদিকে আন্দোলনের জনপ্রিয়তা অপরদিকে সন্ত্রাস আন্দোলনের অপ্রতিহতযাত্রা। সেই ভাঙনের যুগে–সেই চঞ্চলতার যুগে নজরুল 'অগ্নিবীণা' 'বিশেষ বাঁশী' 'প্রলয় শিখা' হাতে নিয়ে বিপ্লব ও সংগ্রামকে কামনা করলেন–তার মধ্যে যুক্তি আছে কি নেই এটুকু ভেবে দেখার শক্তি তখন আমরা হারিয়ে ফেলেছি, যাহোক একটা কিছু পেলেই বেঁচে যাই এরকম মনোভাবই সেদিন আমাদের ছিল। নজরুল সেই বেঁচে যাবার মন্ত্রই উচ্চারণ করলেন––সর্বপ্রকার অসদাচরণ ও অকল্যাণ, অনুদার ও অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে জাতি ও দেশকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সংগ্রামকে অবলম্বন করা আর এই সংগ্রাম শুধু

বুদ্ধিজীবি মহলে আবদ্ধ না রেখে জনতার দুঃখ, ব্যাথা বেলার মধ্যে প্রমাণিত করে দিয়েছিলেন বলেই সেদিন অবাক বিস্ময়ে তাঁর কথা শুধু শুনিনি তাঁর মতাদর্শে চলার প্রেরণা নিয়েছি।" আজহারউদ্দীন খান এখানে নজরুলকে দেশনায়ক করেছেন, মুক্তিব্রতী হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু এমন অবস্থায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে কাছে পাননি এবং সে কথা একবারের জন্য তিনি বলেননি। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইট' উপাধি বর্জন করেছেন। কিন্তু অসহায় জাতির পাশে এসে তিনি নজরুলের মত দাঁড়াননি। রবীন্দ্রনাথ কি নিজেকে এক্ষেত্রে গুটিয়ে নিলেন–কার স্বার্থে? নজরুলের কবিতা পাঠ করলেইতো বোঝা যায়, নজরুলের অনুভূতি তখন কি ছিল। এমন মুহূর্তে আহজারউদ্দীন খান নজরুল সম্বন্ধে আরো যা বলেছেন তাতে দুঃখ হয় তার জন্যে।

আজহারউদ্দীন খান বলেছেন যে সময়ের পরিবর্তনে নজরুল ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে গেছেন, বিশেষ করে, যখন তিনি শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামের তৌহিদের বাণীর মধ্যে আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি বলেনঃ "সময়ের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার ফলে সময়ের পরিবর্তনে তিনি নিজেকে অসহায় ভেবেছেন–এটা কোন মহাকবির লক্ষণ হতে পারেনা। তাই তাঁর অনেক কবিতাই আজ নিষ্ফল হয়ে গেছে, যুক্তি-বিন্যস্ত, সমাজ রূপান্তরের কার্যক্রম অনুসৃত করার ধাত তাঁর ছিলনা। ফলে তিনি যে সময়ে নিজেকে বিকশিত করলেন পরবর্তীকালের কবিরা সে পরিবেশ থেকে রসগ্রহণ করে অন্যজগৎ সৃষ্টি করেছেন–উচ্ছ্বাস তাদের স্পর্শ করেনি, জীবনের নবীনতর প্রত্যয়ে তারা আরও গভীর এবং আরও সার্থক। কাজেই কি করে বলা যায় যে 'রবীন্দ্র যুগ' শেষ হয়ে যাচ্ছে 'নজরুল যুগ'-এর প্রসার হচ্ছে? নজরুল আবার যুগের সৃষ্টি করলেন কোথায়––চেতনার মধ্যে মত্ত হওয়ার সুর ফোটালেই কি যুগ সৃষ্টি করা যায়? প্রশস্তির নামে এই ব্যভিচার আমরা কিছুতেই সহ্য করবনা।" (আজহারউদ্দীন পৃ. ১০০-১০১)

রবীন্দ্রভক্তি ও প্রেম আজহারউদ্দীন খানকে এতদূর একপেশে করেছে যে তিনি নজরুলের কবিতাকে আদৌ সহ্য করতে পারছেন না। উপরিউক্ত বক্তব্য কোন যথার্থ সমালোচকের বক্তব্য হতে পারে না। নজরুল নিজেই কোন যুগ সৃষ্টি করেন নি। তিনি কবি। তাঁর কাব্যে কোন স্বাতন্ত্র বা নতুনত্ব থাকলে তা বুঝবেন পাঠক। একজন কাবির প্রতি একজন সমালোচকের এমন বিষেদগার আমাদের সজনীকান্ত দাস এবং মোহিতলাল মজুমদারকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আজহারউদ্দীন খান রবীন্দ্রনাথের প্রতি এতই পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন যে তিনি সরাসরি আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি এবং এ আক্রমণে আজহারউদ্দীন খান অখণ্ড ভারতবর্ষে বিশ্বাসী। নজরুলের কাব্যে তিনি এই অখণ্ড ভারতের কথা শুনেছেন। তাই শব্দের অনৈতিক প্রয়োগ পীড়াদায়ক। নজরুলকে কেউ পাকিস্তানের কবি বলবে তা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। এটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কথা। নজরুল আজীবন কোন সম্প্রদায় বা ধর্মের কবি ছিলেন না। তাঁর ধর্ম মানবধর্ম। মানুষই তাঁর কাব্যে সবচাইতে বড়।

কিন্তু যে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভারতবর্ষকে বিভক্ত করেছিল সেখানে পাকিস্তান একা দায়ী ছিলনা, তখনকার কংগ্রেস পাকিস্তান দাবীর অনেক আগেই হিন্দুস্তান দাবী বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নিয়েছিল। দেশভাগের আগে কলকাতাই যে রায়ট হয়েছিল তা কংগ্রেসের নিজস্ব কীর্তি ছিল। আজও গুজরাটে মুসলিম রক্ত শুকিয়ে যায়নি। আজহারউদ্দীন খানকে বুঝতে হবে কোন প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা স্বতন্ত্র আবাসভূমি চেয়েছিল। ভারতীয় দর্শন ও ইসলাম এক জিনিষ নয়। ইসলাম কোন সম্প্রদায়ের নাম নয়। আল্লাহর বাণী গোটা মানব জাতির জন্য। পবিত্র কোরআন শরীফে মানুষকেই আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষই তাঁর বান্দা। সে জন্যে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য তাঁর নির্দেশনা কোরআন মজিদ এসেছে প্রত্যেকের অনুসরণের জন্য।

সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে হিন্দুরাই যে অগ্রগামী ছিল ইতিহাস তার সাক্ষী। পাকিস্তান নজরুলকে তাদের কবি বলে যদি ভেবে থাকে তাতে দায়ভার পাকিস্তানের, নজরুলের নয়।

নজরুল জাত মানেননি। হিন্দু-মুসলিম এই চেতনা তাঁর মধ্যে কোন দিন ছিলনা। কিন্তু ভারতীয় তথা পশ্চিম বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের যে এক বড় অংশ নজরুলকে অছ্যুৎ করেছে এমনকি তাঁর পানি স্পর্শ করাও পাপ মনে করেছে, আজহারউদ্দীন খানের কাছে তা বোধ হয় অজানা ছিল। অনেক হিন্দু কবি-সাহিত্যিক এই ধরনের ক্ষুদ্র মনোবৃত্তির জন্য হিন্দুদেরকে কঠোরভাষায় সমালোচনা করেছেন।

এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা যে পাকিস্তানে ছিল না এমন নয়। নজরুল সেখানেও একশ্রেণীর মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের কাছে অপাঙক্তেয় ছিলেন-সে কথা আগেই বলেছি। দুঃখ লাগে, ভারতে নজরুলের যে অবস্থান থাকার কথা ছিল ভারত সরকার এবং ভারতীয়রা তা ভুলে গেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নজরুলের 'কাণ্ডারী হুশিয়ার'কে জাতীয়সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়েছিলেন। হিন্দু মুসলিম মিলনের জন্য এমন গান কস্মিনকালে কেউ খকনও শোনেনি। নজরুল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থেকেও উভয় দেশেই সাম্প্রদায়িক হয়ে রইলেন।

আজহারউদ্দীন খান ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে নজরুলের কবিতার আবেদন আগামী দু'দশ বৎসরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কারণ তিনি মনে করেন তাঁর কাব্য এবং সাহিত্যে স্থায়িত্বের কিছু নেই।

আজহারউদ্দীন খানকে তাই বলতে হয়, তিনি চোখ মেলে দেখুন, নজরুল এখনও ফুরিয়ে যাননি। মানুষে মানুষে সংঘাত ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। শ্রেণীবৈষম্য, জাতিভেদ বেড়েই চলেছে, দারিদ্র্য দূর হতে কত সময় লাগবে আমরা জানিনা। অন্যায়, শোষণ–আসন, উচ্চবিত্ত–নিঃবিত্তের সংঘাত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নজরুলের প্রয়োজন তাই এখনও ফুরোয় নি। ভবির্ষতেও পুরোবে না-এমন আশা করাটা অযৌক্তিক হবে না।

সাম্প্রদায়িকতা ক্রমান্বয়ে ভারতে ও বাংলাদেশে দানা বাঁধছে। উভয় দেশেই মুসলিম নিধন চলছে। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে মুসলমানেরাই মুসলমানদের শত্রু হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা আজ তাদের মধ্যে নেই। হিন্দুদের মধ্যেও সেই একই মনোভাব। বেদ-গীতা'য় যে মানুষের কথা বলা হয়েছে, সাম্প্রদায়িক হিন্দু সমাজ তা ভুলেছে। নজরুল তাই জাত নিয়ে যারা বড়াই করে তাদের বিরুদ্ধে কষাঘাত করেছেনঃ

জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে?
জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া ॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি
ভাবলি এতেই জাতির জান
তাইতো বেকুব, করলি তোরা
একজাতিকে একশ' খান
এখন দেখিস ভারত-জোড়া
পক্ষে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু
জাত শেয়ালের হুক্কা হুয়া ॥
জানিস না কি ধর্ম সে যে
কর্ম মম সহন-শীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে
ছোঁওয়া-ছোঁয়ির ছোট্ট ঢিল?
যে জাত ধর্ম ঠুনকো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সেত
যাক না সে জাত জাহান্নামে
রইবে মানুষ, নাই পরোয়া ॥

নজরুল স্বাপ্নিক ছিলেন। কিন্তু তা কোন সম্প্রদায়ের স্বপ্ন ছিল না। গোটা ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানদের আবাসভূমি। এখানে প্রত্যেকের পরিচয় হবে মানুষ হিসেবে, ধর্মের পরিচয়ে নয়। ধর্ম থাকবে মানুষের কর্মে, জীবনের ঐশ্বর্যে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক 'প্রমথ'র মুখ দিয়ে নজরুল তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষের কথা বলেছেনঃ

'আমার ভারত ও মানচিত্রের ভারতবর্ষ এক নয় রে অনিম! আমার ভারতবর্ষ, ভারতের এই মুক দরিদ্র নিরন্ন পর পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন তীর্থ, ওরে এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমান মসজিদের ভারতবর্ষ নয়–এ আমার মানুষের–মহামানুষের মহাভারত।'

এমন কথা যিনি বলতে পারেন তাঁর প্রতি ভালবাসা যদি প্রবল হয়েই দেখা দেয় এবং এর মধ্যে তিনি যদি নতুন জগৎ, নূতন ভারতবর্ষের কথা বলেন এবং এসব কথা যদি তাঁর কবিতা গল্প, উপন্যাস এবং গানে প্রতিফলিত হতে দেখি তবে কি তিনি দ্রুত নিঃশেষিত হবেন?

আজহারউদ্দীন খান কি বলেন?

বস্তুত, আজহারউদ্দীন খান, নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে যা বলেছেন তা নিতান্তই পক্ষপাত দুষ্ট এবং অবিবেচনাপ্রসূত। এ প্রসঙ্গে নজরুলের সিনিয়র বন্ধু কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ আজহারউদ্দীন খানের নানা বক্তব্যকে আদৌ সত্যনিষ্ঠ বা বাস্তবধর্মী বলে মনে করেননি। আজহারউদ্দীন খান মোহিতলাল ও নজরুল ইসলামকে নিয়ে বড় গ্রন্থ লিখেছেন। দুইজনের আলোচনায় তিনি অহেতুক নজরুলের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। বিশেষ করে মোহিতলালের 'আমি' ও নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়ে। আজহারউদ্দীন মোহিতলালের অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সে কারণে তিনি মনে করেন যে মোহিতলাল নজরুলকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং সেটি নজরুলের জীবনে কার্যকর হয়েছিল। মোহিতলালের 'আমি' যে আদৌ 'বিদ্রোহী'র সমকক্ষ নয়, আজহারউদ্দীন তা স্বীকার করেও মোহিতলালের অভিশাপের ফলে যে নজরুলের দুর্গতি হয়েছিল তা তিনি উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে মুজফ্ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে আজহারউদ্দীন সম্বন্ধে বলেনঃ

"জনাব আজহারউদ্দীন সাহেব, আপনি তো বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগের শিক্ষিত যুবক। আপনার মনে অভিশাপের কুসংস্কার কি করে বাসা বাঁধতে পারল। আপনি মোহিতলালের কথাও কেন একবার ভাবছেন না? তিনি জীবনে এত মনোকষ্ট কেন পেলেন? এত সমস্যাতেই বা কেন ভুগলেন? আপনিতো বলেছেন তাঁকে 'অতি পরিচয়ের অপরিচয় দিয়ে সরিয়ে রাখা হয়েছে।" মাত্র ৬৪ বছর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটেছে। এসব কেন হল? কার অভিশাপে?

আপনি কাজী নজরুল ইসলামের চরিতকার। আপনার পুস্তকে তাঁর ব্যাধির কথা লিখেছেন। বৃটেনের ডাক্তারদের অভিমতের উল্লেখ আপনার পুস্তকে আছে। ভিয়েনার ডাক্তার হান্স হফ যে শেষ মত দিয়েছেন তাও লেখা আছে আপনারই পুস্তকে। তাঁর মত হচ্ছে কবি 'পিক্স ডিজিজ' নামক মস্তিষ্কের রোগে ভুগছেন। এই রোগে মস্তিষ্কের সম্মুখ ও পার্শ্ববর্তী অংশগুলি সংকুচিত হয়ে যায়। এই কারণেই কবি আজ হৃতসম্বিৎ ও রুদ্ধবাক্। এইসব কথা আপনার পুস্তকে লিখেও আপনি মোহিতলালের অভিশাপকে টেনে এনেছেন। মহাভারতের কাহিনীতে যা ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর ব্যস্তজগতে তা ঘটা সম্ভব নয়। মোহিতলালের অসম্ভব অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাকে তুলে ধরার জন্য নজরুলের চরিতকার হয়ে আপনি তার ওপরে অবিচার করেছেন। কিন্তু আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি মোহিতলালের উপারেও অবিচার করেছেন। নজরুলের মতো মোহিতলাল হৃতসম্বিৎ হননি বটে। কিন্তু ব্যাধিতে তিনিও ভুগেছেন,

নানান রকম দুর্গতির সম্মুখীন তিনিও হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত অকালে ৬৪ বছর বয়সে তাঁর হাসপাতালে মৃত্যু ঘটেছে। দেশের সব লোক তো আপনি নন। তাঁরা কি ভাবতে পারেন না যে শাপগ্রস্ত হয়েই মোহিতলাল এত কষ্ট পেয়েছেন এবং অকালে মরেছেন? কার শাপ লেগেছিল তাঁর ওপরে? নজরুলের? কাহিনীর অভিশাপ তো শুনেছি দু'পক্ষের উপরেই দু'পক্ষের লাগত।" (মুজফ্‌ফর আহমদ, পৃ. ১৫০-১৫১)

আজহারউদ্দীন খান হয়তো জানতেন না মোহিতলাল ও নজরুলের মধ্যেকার প্রীতিময়তা ও ভালবাসার কথা। নজরুল মোহিতলালকে শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু তার যে একটা খবরদারিভাব মোহিতলাল মজুমদারের মধ্যে ছিল নজরুল তা আদৌ পছন্দ করতেন না। শুধু মোহিতলাল মজুমদার নন, এমন কবিকেই নজরুল পছন্দ করতেন না যাঁরা তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন। মোহিতলাল নজরুলের প্রতিভাকে জানতেন এবং তিনি যে একজন বড় মাপের কবি ছিলেন সেটা বুঝেই তিনি তাঁর কবিতা শোনাবার জন্য নজরুলের নিকট আসতে আগ্রহী ছিলেন। 'আমি' কবিতাটিও তিনি শোনাতে চেয়েছিলেন এবং শুনিয়েছিলেনও। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহমদের ভাষায় নজরুল তেমন মনোযোগ দিয়ে তাঁর কবিতা সেদিন শোনেননি। এর অনেকদিন পরে অর্থাৎ একবছরের বেশিদিন পরে নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখেছিলেন এবং তা যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে গেল, তখন মোহিতলালের মনে দারুণ ঈর্ষা জেগেছিল এবং তারই ফলে দু'জনের মধ্যে কবিতায় কাদাছোঁড়াছুঁড়ি। অবশ্য এ কাজে মোহিতলালই অতিমাত্রায় অগ্রণী ছিলেন। মুজফ্‌ফর আহমদ মোহিতলাল ও নজরুল বিষয়ে আজহারউদ্দীন খানের জ্ঞাতার্থে যা লিখেছিলেন সে সম্পর্কে আজহারউদ্দীন খান আর কিছুই বলতে সক্ষম হননি।

এখানে বলা আবশ্যক যে, কমরেড মুজফ্‌ফরের মধ্যে নজরুলকে এত গভীরভাবে জানা এবং তাঁর ভালো-মন্দ নিয়ে এতটা চিন্তা করা আমি অন্য কোন লেখক বা গ্রন্থকারের মধ্যে দেখিনি। নজরুলের অনেক বন্ধুই তাদের রচনায় যে সব তথ্য দিয়েছেন তার অনেকগুলোই যে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য ছিল, মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে সে সবের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আমার মনে হয়েছে নজরুলকে এমনভাবে জানতে পারাটা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে জন্যে মুজফ্‌ফর আহমদের নজরুল সম্বন্ধে এই 'স্মৃতিকথা' পাঠক এবং গবেষকদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

নজরুলকে নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে তন্মধ্যে ড. সুশীল কুমার গুপ্তের 'নজরুল চরিত মানস' নিঃসন্দেহে একটি তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ। আজহারউদ্দীন খান ও আব্দুল আজীজ আল আমান প্রমুখ লেখকবৃন্দ নজরুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়েই মনগড়া তথ্য দিয়েছেন বলে মুজফ্‌ফর আহমদ দাবী করেছেন। তাঁর 'স্মৃতিকথা' পাঠ করে মনে হয় তিনি নজরুলকে 'যক্ষের ধন' এর মতো আগলিয়ে রেখেছেন। এটা ঠিক যে সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে নজরুল বন্ধু বা সুহৃদ হিসেবে মুজফ্‌ফরকেই পেয়েছিলেন এক বাড়ীতেই দীর্ঘদিন থাকার কারণে। বলতে কি, নজরুলের কবি-খ্যাতির মূলে 'মোসলেম ভারত' কিংবা 'সওগাত' পত্রিকা

থাকলেও মুজফ্‌ফর আহমদই তাঁকে বেশী প্রেরণা দিয়েছেন। নজরুল কবি, গীতিকার ও গায়ক হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এরই পাশাপাশি তিনি একজন বলিষ্ঠ সাংবাদিকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। এজন্যে অবশ্য তাঁকে জীবনভোর মাশুল দিতে হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে নজরুল প্রথম থেকেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বৃটিশ ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের থেকে নানা ক্ষেত্রে অত্যন্ত পিছিয়ে ছিল। নজরুল হিন্দু মুসলমান উভয়কেই বিদ্বেষ ভুলে একে অপরের বন্ধু হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর কাব্য ও গানে মুসলমান সম্প্রদায় তাঁকে নিজেদের ভেবে অপরিসীম প্রেরণা লাভ করেছিল, হিন্দুদের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর শ্যামাসঙ্গীতেও তাঁকে হিন্দুদের একজন বলে চিহ্নিত করেছিল। 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতা ও গান সে সময় হিন্দু মুসলমানের মিলনে এক শক্তিশালী সেতুবন্ধন রচনা করেছিল। বলেছি, নজরুলের কালে মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন এবং সে কারণেই তাঁরা একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু নজরুল কখনও নিজেকে মুসলমানদের 'লোক' হিসেবে চিহ্নিত হতে চাননি। তাঁর সময়ে 'মোসলেম ভারত' 'সওগাত' মুসলিম চিন্তা দর্শনের লালন করলেও নজরুল সাংবাদিক হয়ে 'দৈনিক নবযুগ' বের করে নিজেকে অসাম্প্রদায়িক হিসেবে পরিগণিত করেছিলেন। এমনকি যখন দৈনিক নবযুগের মালিক একে ফজলুল হক তাঁর পত্রিকার জন্য মুসলমান নাম খোঁজ করছিলেন তখন নজরুল এবং মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর বিরোধিতা করেন এবং পত্রিকাটির নাম 'দৈনিক নবযুগ' রাখা হয়। নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবের সম্পাদনায় ১৯২০ সালের ১২ জুলাই সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা হিসেবে নবযুগ প্রকাশ পেল। মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"নিশ্চয় নজরুলের জোরালো লেখার গুণে প্রথম দিকেই কাগজ জনপ্রিয়তা লাভ করল। হিন্দু মুসলমান দু'জনাই কাগজ কিনলেন। ফজলুল হক সাহেবের মেশিন খোঁড়া ছিল বলে আমরা চাহিদা মেটাতে পারলাম না। রয়েল সাইজে এক শীট কাগজের দাম করা হয়েছিল এক পয়সা। কাগজে আমার ও নজরুল ইসলামের নাম ছাপা হতো না। প্রধান পরিচালক হিসাবে এ কে ফজলুল হকের নাম ছাপা হতো। দৈনিক কাগজে লেখার অভিজ্ঞতা আমাদের ভেতরের একজনেরও ছিলনা। নজরুল ইসলাম কোন দিন কোন দৈনিক কাগজের অফিসেও ঢোকেনি। তবুও সে বড় বড় সংবাদগুলি পড়ে সেগুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত করে নিজের ভাষায় লিখে ফেলতে লাগল। তা না হলে কাগজে সংবাদের স্থান হয় না। নজরুলকে বড় বড় সংবাদের সংক্ষেপণ করতে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ঝানু সাংবাদিকরাও এই কৌশল আয়ত্ত করতে হিমশিম খেয়ে যান। তার পরে নজরুলের দেওয়া হেডিং এর জন্যও 'নবযুগ' জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা তার পড়া ছিল। সেই সব কবিতার কিছু কিছু কথা উল্লেখ করেও সে হেডিং দিত। সে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়েনি। যেমন ইরাকের রাজা ফয়সালের কি একটা সংবাদকে উপলক্ষ্য করে সে হেডিং দিয়েছিলঃ

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরান সখা ফয়সুল হে আমার।

দৈনিক 'নবযুগে' নজরুল যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিল তার সবগুলি না হলেও অনেকগুলি, হয়তো বেশীর ভাগই, সংগ্রহ করে 'যুগবাণী' নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে ছাপা হয়েছে। পুস্তকাকারে ছাপানোর সময়ে সে হয়তো কিছু লেখায় কিছু পরিবর্তন করে থাকবে। এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে, খ্রীষ্টীয় হিসাবে ১৯৫৭ সালে। কোথাও লেখা নেই যে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ কখন ছাপা হয়েছিল। তবে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে।" (মুজফ্ফর আহমদ, পৃ. ৩৩-৩৪)

মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন যে 'যুগবাণী'র প্রকাশক একটি ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে 'যুগবাণী'তে নজরুল প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন। তিনি এই বিবরণের সত্যতা নিয়ে সমালোচনা করে লিখলেন যে ১৯২২ সালে দৈনিক 'নবযুগের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। নজরুলের লেখাগুলি সবই ১৯২০ সালের লেখা, ১৯২০ সালেই লেখাগুলি 'নবযুগে' ছাপা হয়েছিল। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর এই গ্রন্থে অন্যের দেওয়া তথ্য সংশোধন করে দিয়েছেন। নজরুল জীবন-চরিতের জন্য এটি একটি বড় অবদান। তা না হলে অসখ্য ভুল তথ্য নজরুল সম্বন্ধে থেকে যেত।

নজরুল যে সাংবাদিকতায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন সে বিষয়ে মুজফ্ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করছেন। বস্তুত, সর্বক্ষেত্রেই নজরুলের দক্ষতা ছিল। তাঁর প্রতিভা ছিল বিচিত্রগামী। যেখানে তিনি হাত দিয়েছেন সেখানেই ফুল ফুটেছে।

মুজফ্ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে নজরুলকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে সে রাজনীতিতে যোগ দেবে কিনা। নজরুল তাকে জবাব দিয়েছিলেন যে তিনি সৈনিক জীবন বেছে নিয়েছিলেন রাজনীতির জন্য। আমরা বলেছি, সৈনিক হিসেবে থাকতেই তিনি রুশবিপ্লবের 'লালফৌজ'দের দ্বারা দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নজরুলের আবির্ভাব এমন এক সময়ে হয়েছিল যে সময়টা ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণ। সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসেই নজরুল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও ত্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল। রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং মুজফ্ফর আহমদ, কমরেড আব্দুল হালিম এবং আরও বিপ্লবীদের সাহাচর্যে এসে নজরুল দেশের মুক্তি আন্দোলনে নিজেকে উজাড় করে দিলেন। তাঁর কবিতা, গান, প্রবন্ধ সব কিছুই ছিল ভারতের তথা সাম্রাজ্যবাদের দোসর পুঁজিবাজীদের বিরুদ্ধে লড়ায়ের আহ্বান। সমস্ত অন্যায়, অবিচার, ভীরুতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নজরুল দুর্বিনীত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কবিতা তখন একটি জাতির বেঁচে থাকার লড়াই ছিল। নজরুলের কবিতা তাই বাঁধভাঙ্গার গান ছিল। নজরুলকে দেখেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গানেও পরিবর্তন এসেছিল। নজরুলের সমকালে রবীন্দ্রনাথের

কবিতা ও গান পর্যালোচনা করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যাঁরা তাঁর কবিতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন তাঁদের জন্যে নজরুল তাঁর 'আমার কৈফিয়াৎ' এ সব বলেছেন। কিন্তু যখনই নজরুলকে নিন্দুকেরা বিদ্রুপ ও বিদ্বেষের কষাঘাতে জর্জারিত করেছিলেন, ততই তিনি আরও শক্তিধর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সব রচনাবলীতে ছিল অস্ত্রের ঝনঝনানি। তাঁর কাব্য, গান এবং প্রবন্ধ সব কিছুর ভাষাই ছিল এক জাগরণী মন্ত্রের সাহসী উদাহরণ--সাহিত্যে এ এক নূতন যুগের সূচনা। আর সন্দেহাতীতভাবেই এই নূতন যুগের নৈয়ায়িক হলেন কবি নজরুল ইসলাম।

যাঁরা তাঁর কাব্যে সাময়িকতার অভিযোগ এনে ঘোষণা দেন 'দু' দশ বছরের মধ্যে তিনি ফুরিয়ে যাবেন' তাঁরা যে কত হীন মনোবৃত্তিতে ভুগেছিলেন। আজও মানুষের কাছে নজরুল অম্লান থেকে তাদের হৃদয়ে ঈর্ষার আগুনকে দ্বিগুনভাবে প্রজ্জলিত করছেন। মানুষের মধ্যে যতদিন হীন কদর্যতা, স্বার্থপরতা, শ্রেণীবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা এবং দারিদ্র থাকবে ততদিন নজরুল এদেশের মানুষের মনের কোঠায় চিরজাগ্রত থাকবেন। নজরুল নিজেই তো বলেছেন তাঁর বিদ্রোহী কবিতায়ঃ

মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন ধ্বনি
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীমরণভূমে রণিবেনা

সুতরাং সেই দিন যদি আসে তবে নজরুলর কবিতা, গান, সাহিত্য তার যথাযথ কাজটি সমাধা করলো।

'নবযুগে' নজরুলের লেখনি ছিল সমস্ত অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯২০ সালে ভারতবর্ষের একটি আন্দোলন হয়েছিল যার নাম ছিল হিজরৎ আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে আঠারো হাজার কিংবা তারও বেশি মুসলমান ভারতবর্ষ ছেড়ে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল। ভারতে ইংরেজদের অত্যাচারে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সে সময় বৃটিশ সরকারের গুলিতে যাঁরা মুহাজিরিন বা দেশত্যাগী তাদের হত্যা করা হয়। নজরুল ইসলাম এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তাঁর দৈনিক 'নবযুগে' তিনি এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় লেখেন।

নীচে তাঁর বিবরণ দেওয়া হল: মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?

"আমরা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া যাই নাই হতভাগ্য হাবিবুল্লাহর হত্যা বীভৎসতা। আজও মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন খবর আসিয়াছিল যে, সামরিক পুলিশের সঙ্গে একদল মুহাজিরিন গোলমাল করায় কাচাগাছী নামক স্থানে মহাজিরিনদের ওপর

গুলিবর্ষণ করা হয়। একদল ভারতীয় সৈন্য তিন তিনবার গুলিবর্ষণ করে। তাহাতে মাত্র একজন নিহত ও একজন আহত হয়। কোন মূর্খ বিশ্বাস করিবে একথা? আমরা বলি, একটি আঘাতের বদলেই তিন তিনবার গুলিবর্ষণ করা, এ কোন সভ্য দেশের রীতি? তোমাদের তো সিপাহী সৈন্যের অভাব নেই–বিশেষ করিয়া সেই সীমান্ত দেশে। চল্লিশটি নিরস্ত্র লোককে, তাহারা যদি সত্যই অন্যায় করিয়া থাকে, সহজেই ত গেরেফ্তার করিয়া লইতে পারিতে। তাহা না করিয়া তোমরা চালাইয়াছিলে গুলি। আর কাহাদের উপর? যাহারা স্বদেশের, স্বজনের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য তোমাদের হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে চলিয়াছিল।

কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া, খাইয়া, অপমানে, বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই। আমরা কি মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে খুন কর, আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠা কাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পারিবনা? মনুষ্যত্বের, বিবেকের, আত্মসম্মানের স্বাধীনতার উপর এত জুলুম, কেহ কখনও সহ্য করিতে পারে কি? এই যে সেদিন হতভাগারা হাজার বছরের পরিচিত, সারাজীবনের সুখ-দুঃখ-স্মৃতি বিজড়িত, বাপদাদার ভিটাবাড়ী, আত্মীয় পরিজন জননী জন্মভূমির মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, বড় দুঃখে বড় কষ্টে জীবনের সঙ্গে জড়ানো এই সব স্নেহ-স্মৃতির বন্ধন জোর করিয়া ছিঁড়িয়া এক মুক্ত স্বাধীন অজানার দিকে পাড়ি দিতেছিল, ইহাদের বেদনা বুঝিবার অন্তর তোমাদের আছে কি? মনুষ্যত্বের এই যে মস্তবড় একটা দিক, পরের বেদনাকে আপন করে নেওয়া––ইহা কি তোমাদের আছে? স্বাধীনতাকে, মনুষ্যত্বকে এমন নির্মমভাবে দুই পায়ে মাড়াইয়া চলিবে আর কতদিন? এই অত্যাচারের, এই মিথ্যার বুনিয়াদে খাড়া তোমাদের ঘর––মনে কর কি, চিরদিন খাড়া থাকিবে? এইসব অপকর্মের, এইসব অমার্জনীয় পাপের, এই সব নির্মম উৎপীড়নের জন্য বিবেকের যে দংশন তাহা হইতে তোমাদের রক্ষা করিবে কে? এই মহাশক্তির ভীষণতা আজো কি তোমাদের চক্ষে পড়ে নাই? তোমাদের অত্যাচারে, জুলুমে নিপীড়িত হইয়া, মানবাত্মার–মনুষ্যত্বের এত পাশবিক অবমাননা সহ্য করিতে না পরিয়া মানুষের মত যাহারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়অ দিতে পারিল যে, এখানে আর ধর্মকর্ম চলিবে না, এবং চিরদিনের মত তোমাদের সংস্রব ছাড়িয়া তোমাকে সালাম করিয়া বিদায় লইল––সেই বিদায়ের দিনেও তাহাদের উপর সামান্য পশুর মত ব্যবহার করিতে তোমার লজ্জা হইলনা, দ্বিধা হইলনা! সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া, দল করিয়া গায়ে পড়িয়া তাহাদের সাথে গোলমাল বাধাইলে। হত্যা করিলে। আবার হত্যা করিলে আমাদেরই ভারতীয় সৈন্যদ্বারা। যাহাকে হত্যা করিলে, তাহাকে হত্যা করিয়াও ছাড় নাই, তাহার লাশ তিনদিন ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়া পচাইয়া গলাইয়া ছাড়িয়াছ। মৃতের প্রতিও এত আক্রোশ, এত অসম্মান কেবল তোমাদের সভ্যজাতিই একা দেখাইতে পারিতেছে। তোমাদেরই কিচনার–লর্ড কিচনার

মেহেদীর কবর হইতে অস্থি উত্তোলন করিয়া ঘোড়ার পায়ে বাঁধিয়া ঘোড়দৌড় করিয়াছে, তোমাদের এই সৈন্যদল যে তাহারই শিষ্য। না জানি আরো কত বাছাদের, আমাদের কত মা-বোনদের খুলি উড়াইয়াছ, তোমরাই জান। আমাদের যে ভাই আজ তোমাদের হাতে শহীদ হইল, সে এমন এক মুক্ত স্বাধীন দেশে গিয়া পৌঁছাইয়াছে যেখানে তোমাদের গুলি পৌঁছিতে পারে না। সে যে মুক্তির সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল। মনে রাখিও, সে খোদার আরশের যাঁরা ধরিয়অ ইহার দাদ (বিচার) মাগিতেছে। দাও, উত্তর দাও! বল তোমার কি বলিবার আছে।' (মুজফ্ফর আহমদ, পৃ. ৩৫-৩৬)

উপরিউক্ত লেখাটি 'যুগবাণীতে' প্রকাশিত। কি অসাধারণ দরদভরা লেখনি দ্বারা ইংরেজ সরকার এবং তাবেদার ভারতীয়দের বিরুদ্ধ তিনি প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকে এমন জোরালো ভাবে আর কোন লেখক করেন নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের সমকালের আর কোন কবি সাহিত্যিকদের লেখায় এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ আসে নি। ভারতীয়রাই ভারতীয়দের হত্যা করেছে বৃটিশ প্রভুদের সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং মুসলমানদের হত্যাকাণ্ডে তাদের প্রাণ গলেনি। এই ভারতীয় সৈনিক এবং ইংরেজ সরকারের চাকুরীজীবিরা এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদেরকেও নিধন করেছে। তাদের মধ্যে কোন দেশপ্রেম ছিল না। এরা বিদেশী প্রভুদের পদলেহন করে নিজের জীবনকে বাঁচিয়েছে। নজরুলের এই প্রতিবাদ মুসলমানদের জন্য ছিল না। তিনি এই হত্যাকাণ্ডে মনুষ্যত্বের মৃত্যু দেখতে পেয়েছিলেন।

নজরুলের মত কোন কবি প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেননি। তাঁর এই লেখায় নজরুল শুধু যে ইংরেজদের নিষ্ঠুরতাকে দেখিয়েছেন তা নয়। এর মধ্যে এদেশের একশ্রেণীর প্রভুভক্ত পরজীবি মানুষদের বিরুদ্ধ তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিক হিসেবে নজরুল অসামান্য কৃতিত্ব রেখেছেন তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধসমূহে এবং সংবাদ পরিবেশনার মাধ্যমে।

প্রসঙ্গেত, পুনরায় মুজফ্ফর আহমদের কথা বলতেই হয়। তাঁর কারণে নজরুলের অনেক অনুল্লিখিত দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। বয়সে তিনি বড় ছিলেন কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্বে তা বাঁধা হয়নি। নজরুল আজীবন কারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি নিজে যা ভাল বুঝেছেন তাই-ই করেছেন। এতে সব সময় যে তাঁর ভাল হয়েছে, তা নয়। তাঁর চরিত্রটাই ছিল এমন। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় যা বলেছেন তার সবটুকুই এখানে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। অনেক অজানা তত্ত্ব এখানে এসেছে। অন্যেরা নজরুলের জীবনচরিত লিখতে গিয়ে যে ভুল করেছেন, মুজফ্ফর আহমদ তা সংশোধন করেছেন। আবার নিজের ভুলও তিনি দ্বিধাহীনভাবে সংশোধন করেছেন। দৈনিক 'নবযুগে' শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের অবিচারের কথাও তিনি লিখেছেন। মালিকদের হাতে শ্রমিক নিধনের ঘটনাটিকেও তিনি টেনে এনেছেন। এসব লেখার কারণে দৈনিক 'নবযুগ' শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং ইংরেজ সরকার নজরুলকে নানাভাবে দমন করারও চেষ্টা করেছে।

'দৈনিক নবযুগ' এর পরে নজরুল 'ধূমকেতু' পত্রিকা বের করেছিলেন। নজরুলের সঙ্গে মাওলানা আকরাম খান সাহেবের ভাল সম্পর্ক ছিল না। নজরুল তাঁকে তেমন পছন্দ করেন নি। 'সওগাত' প্রসঙ্গে তার বিবরণ পাওয়া যাবে।

নজরুল মাওলানা আকরাম খানের 'সেবক' পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করেছিলেন। এখানে মূলত, তিনি সম্পাদকীয় ইত্যাদি লিখতেন। মুজফ্ফর আহমদের লেখায় আমরা জানেত পারি নজরুলের তিনি 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর নজরুল যখন কুমিল্লায় ছিলেন সে সময় 'সেবক' পত্রিকায় কাজ করার জন্য নজরুলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এসময় 'সেবক' পত্রিকা তেমন বিক্রি হচ্ছিল না। সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ ওয়াহিদ আলী। কাগজের বিক্রয় পড়ে যাবার জন্যে নজরুলের খোঁজ পড়েছিল। তাঁকে মাসিক একশত টাকা দেওয়া হবে এই শর্তে নজরুল 'সেবক পত্রিকায় যোগ দিলেন। কাগজটি পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠল। বলেছি, নজরুল মাওলানা আকরাম খান প্রতিষ্ঠিত এই কাগজে স্বাচ্ছন্দবোধ করছিলেন না। এর মধ্যে জনৈক হাফিজ মসউদ আহমদ নজরুলকে দিয়ে একটি নূতন পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। নজরুল 'ধুমকেতু' নামে এই পত্রিকা বের করতে রাজী হয়ে যান। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন নজরুল সর্বান্তকরণে দেশপ্রেমী ছিলেন। সৈনিক জীবনেই তিনি রুশ বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং দেশে ফিরেই কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব জমে ওঠে। তিনি রাজনীতিমনস্ক হয়ে ওঠেন। একসময়ে তাঁরা উভয়ে মিলে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করতেও মনস্থ করেন। শৈশব-কৈশোর থেকেই নজরুল বৃটিশ বিরোধী ছিলেন। কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন হওয়ায় বিত্তশালীদের বিরুদ্ধেও তিনি কলম ধরেছিলেন। নজরুল রবীন্দ্রনাথকে কখনও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ না করলেও তাঁকে আজীবন 'গুরু'র মর্যাদায় রেখেছিলেন। নিজের গান গাইবার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন এবং তিনি জনপ্রিয়তাও লাভ করেন। কবিতা ও সাহিত্যকর্মকে নজরুল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করায় তাঁর লেখালেখি নির্ভেজাল সাহিত্য এবং কাব্যচর্চা থেকে একটু আলাদা ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কোমল কুসুম পেলবতা থেকে স্বতন্ত্র ভাব-ভাষা সমৃদ্ধ ছিল নজরুলের কবিতা ও সাহিত্যকর্ম। তবে সর্বক্ষেত্রেই 'দেশ' এবং নিগৃহীত এবং দরিদ্র-পীড়িত মানুষই ছিল তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের বিষয়। অবশ্য তাঁর 'প্রেম' বিষয়ক কবিতায় কোমল পেলবতা এক নূতন মাত্রা পেয়েছিল--তবে তা নিঃসন্দেহে 'রাবীন্দ্রিক' ছিলনা।

রবীন্দ্র-নজরুল প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ নজরুলের এই কাব্যচর্চাকে জঙ্গীভাবনাজাত মনে করতেন। কারণে তিনি তলোয়ার দিয়ে দাঁড়ি চাঁছা'র কথা বলেছিলেন। কেউ কেউ এটাকে ব্যঙ্গ মনে করে মজা পেলেও নজরুল তাতে ক্ষুব্ধ হননি। মুজফ্ফর আহমদ লেখেনঃ

"আমি নজরুলের মুখে যা শুনেছিলাম তা হচ্ছে এই যে, সাক্ষাতের প্রথম দিনেই রবীন্দ্রনাথ কথাটা নজরুলকে বলেছিলেন। তখনও তিনি ভাবেননি যে নজরুল গভীরভাবে রাজনীতিক সংগ্রামে বিশ্বাসী। নজরুল কবি, কাব্যচর্চাই তার পেশা হওয়া উচিত, তার মানে রাজনীতিতে তাঁর যাওয়া উচিত নয়--এই সব ভেবেই তিনি 'তলওয়ার দিয়ে দাঁড়ি ছাঁছা'র কথাটা বলেছিলেন। অন্তত, নজরুল তাই বুঝেছিল। রবীন্দ্রনাথ শুধু এই কথা বলেই চুপ করে যাননি। তিনি তার সঙ্গে একটি প্রস্তাবও দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, নজরুল শান্তিনিকেতনে যাক। সেখানে সে ছেলেদের কিছু ড্রিল শেখাবে আর গান শিখবে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে।

কিন্তু 'ধূমকেতু'র জন্যে নজরুল যখন রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে বাণী চাইল তখন তিনি তাকে বুঝে ফেলেছিলেন। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে সে নিজে যে-পথ বেছে নিয়েছে তাকে সেই পথে যেতে দিলেই সে বিকশিত হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ যে বাণী নজরুলকে পাঠিয়েছিলেন সেটা ছিল নজরুলের প্রতি তাঁর রাজনৈতিক আশীর্বাদ।" (পৃ. ১৫৯)

'ধূমকেতু'র জন্যে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপঃ

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু
আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশীরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্‌না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন।
– শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৯ শ্রাবণ, ১৩২৯

রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে নজরুলকে বুঝতে পারেনি নি বলেই তাঁকে শান্তিনিকেতনে ছেলেদের ড্রিল শেখানোর মতো একটা সাধারণ কাজ ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গান শিখবার কথা বলেছিলেন। ভেবেছিলেন, নজরুল অন্যদের মতো 'এটা একটা সৌভাগ্যের বিষয়' বলে ভেবে শান্তিনিকেতনে চলে যাবেন। কিন্তু নজরুলতো নিজেই চলতে শিখেছেন। জীবনে দুর্যোগের ঘনঘটা পাড়ি দিয়ে তাঁকে এগুতে হয়েছে। নজরুল তাঁর সময়ে যে কাজেই হাতে হাত দিয়েছেন সেখানেই রত্ন ফলেছে। জীবনে সাংবাদিকতা কোন দিন না করেও সাংবাদিক হিসেবে তিনি যে ভূমিকা রেখেছেন সেটিও অন্যদের জন্য অনুকরণ এবং অনুসরণযোগ্য হয়ে রয়েছে। সত্য প্রকাশে তিনি অকুতোভয় ছিলেন। জেলে যেতেও তাঁর ভয় ছিলনা।

নজরুল রবীন্দ্রনাথ হতে চাননি। কিন্তু আমাদের মধ্যে একদল রয়েছেন যাঁরা নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের সাথে তুলনা করাটা 'একটা কাজের কাজ' বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কাব্য বিচারে তাঁকে 'একজন প্রতিভাবানবালক' যিনি সারাজীবন হৈচৈ করে গেলেন এমন মনে করেছেন। তাঁর কাব্য আদৌ কাব্য নয় তাঁর লেখা কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প সাহিত্য পদবাচ্য নয় এমন উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যে ভাললাগা, মন্দ লাগা আছে। সবকালেই এমনটি ছিল। সুতরাং কারো ভালা লাগা, মন্দ লাগাতে লেখকের কোন কিছুই যায় আসেনা। তা'হলে এই হীনমন্যতা প্রদর্শনে কোন লাভ আছে কি?

নজরুল ঃ অখণ্ড ভারতের স্বাপ্নিক কবি

এবারে যেটা বলতে চাই, সেটা শুনলেও নিন্দুকেরা একেবারেই ক্ষেপে যাবেন। নজরুল কিশোর থেকেই বৃটিশদের সহ্য করতে পারেননি। শৈলজানন্দ তাঁর 'কেউ ভোলে না কেউ বলে' এ বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন। 'ধুমকেতু' প্রকাশনার মাধ্যমে নজরুল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষদের চাঙ্গা করতে চেয়েছিলেন। আসলে এদের মধ্য থেকেই চিরকাল নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। বৃটিশভারতে যাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হতো তাঁরা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা মানুষ। এঁরাই জনগণকে সংঘটিত করেন। সুতরাং 'ধূমকেতু'র বক্তব্য তাঁদের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে যেত। বিশেষ করে তরুণেরা নজরুলকে তাঁদের মনের মণিকোঠায় রেখেছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নজরুলই সর্বপ্রথম অকুতোভয়ে 'ধুমকেতু' তে নিবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯২২ সালে ১৩ অক্টোবর 'ধূমকেতুতে লেখেনঃ

"প্রথম সংখ্যার 'ধূমকেতুতে 'সারথির পথের খবর' প্রবন্ধে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করেছিলাম, যা বলতে চাই, তা বেশ ফুটে ওঠে নি মনের চপলতার জন্য। আজও হয়তো নিজেকে যেমনটি তেমনটি প্রকাশ করতে পারব না, তবে এই প্রকাশের পীড়ার থেকেই আমার বলতে-না পারা বাণী অনেকেই বুঝে নেবেন--আশা করি।

সর্বপ্রথম 'ধুমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

স্বরাজ টরাজ বুঝিনা, কেননা, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবেনা। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবেনা। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগরপাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন

করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখানো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।"

নজরুল বন্ধু মুজফ্ফর আহমদ বলেনঃ "অনেকে হয়তো নিজেদের বৈঠকখানায় বসে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিংবা হয়তো গোপন ইশতিহার ছেপে তার মারফতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু এমন দ্ব্যর্থহীন, চাঁছা-ছোলা ভাষায় খবরের কাগজের ঘোষণা করে বাংলাদেশে নজরুলের মতো আর কে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে তুলে ধরেছিলেন তা আমার জানা নেই। লক্ষ রাখতে হবে যে আমি ১৯২২ সালের কথা বলছি, যখন গান্ধীজী বলেছিলেন, 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' পেলেই তিনি 'ইউনিয়ন জ্যাক (বৃটিশ পাতা) উড়িয়ে দিবেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নজরুলের ভারত স্বাধীন করার প্রস্তাব সকলের মনে সে সময় দারুণ উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। ভয়ে একই সময়ে আর একজন মুসলমান উর্দুভাষার বরেণ্য কবি ফজলুল হাসন হসরৎ মোহানী আহমদাবাদে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস ও অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের যৌথ বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উথাপন করেন। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছিলঃ

The object of the Indian National Congress is the attainment to Swaraj or complete independence free from all foreign control by the people of India by all legitimate and peaceful means.

হসরৎ মোহানীর আগে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে আর কখনও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উথাপিত হয়নি। গান্ধীজীর তীব্র বিরোধিতায় প্রস্তাবটি পাস হতে পারেনি। (পৃ.১৬০-১৬১)

মুজফ্ফর আহমদ এ প্রসঙ্গে লেখেনঃ

"কিন্তু মাওলানা হসরৎ মোহানীকে প্রস্তাবটি উত্থাপনের কারণে ফল ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আহমদাবাদের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের Indian Penal Code ১২৪-এ ধারা (রাজদ্রোহ) ও ১২১ ধারার (সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা) মকদ্দমা রুজু হলো।" (পৃ. ১৬২)

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ মুজফ্ফর আহমদের গ্রন্থে রয়েছে। তবে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুল যেভাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন তাঁর আগে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা কোন বৈধ কাগজে এমন খোলাখুলিভাবে কেউ বলেননি। সুতরাং ভারতে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নজরুলকে স্বপ্নদ্রষ্টা বলা হলে অত্যুক্তি হবেনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নজরুল মুসলমান বলেই কিনা জানিনা, নজরুলের এই বক্তব্য তৎকালীন রাজনীতিক মহলে তেমন সাড়া জাগায়নি। অথচ দেশের জন্য নজরুলকে বহুবার জেলে যেতে হয়েছে। কোন কবিকে সারা পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার জেলে যেতে হয়নি।

বলতে কি, নজরুল দেশের মুক্তির জন্য সাহিত্য কর্মকে সংগ্রামের মাধ্যম বানিয়েছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য।

নজরুল তার অনেক লেখায় ও গানে হিন্দুদের দেব-দেবীর কথা উল্লেখ করেছেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু মোহিতলাল মজুমদার নজরুলের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে বললেন-"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরধর্মো ভয়াবহ:! 'ধূমকেতু' প্রকাশ করতে গিয়ে নজরুলকে নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। এর সাথে পুলিশী ঝামেলা তো ছিলই। এ প্রসঙ্গে মুজাফ্ফর আহমদ বলেনঃ

"৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীট হতে 'ধূমকেতু'র সাত-আট সংখ্যা বার হয়েছিল। শীল ভ্রাতৃদের বাড়ীর এই অংশটা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' ভাড়া নিয়েছিল। তা থেকে একখানা ঘর আফজালুল হক সাহেবকে সাহিত্য সমিতি সব্-লেট করেছিল। এই কথা আমি আগেও বলেছি। 'ধূমকেতু'কে নিয়ে পুলিশের হাঙ্গামা হতে পারে ভেবে শীল ভ্রাতৃগণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফজালুল হক্ সাহেব শীলেদের ভাড়াটে ছিলেন না। এই সুযোগ নিয়ে শীলেদের যে ভাইটি উকিল ছিলেন তিনি রাগে গরগর করতে করতে একদিন এসে বললেন যে, "এখান হতে আমরা 'ধূমকেতু' বার করতে দেব না।"

মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন যে নজরুল আগে থেকেই বাড়ীটা ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। অতপর 'ধূমকেতু' ৭ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের একটি বাড়ী থেকে প্রকাশিত হতো। এখানে বলা প্রয়োজন যে নজরুলের মধ্যে 'দেশপ্রেম' এতই গভীর ছিল যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও নজরুল নিয়মিত লিখেছেন। এই লিখতে গিয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মালিকদের একজন শ্রী মৃণালকান্তি ঘোষ নজরুলকে 'আনন্দবাজার পত্রিকার'র পূজা সংখ্যার জন্য 'আগমনী' নামে একটা কবিতা লিখতে অনুরোধ করেন। মৃণালকান্তি ঘোষের সঙ্গে নজরুলের ভালো সম্পর্ক ছিল। নজরুল 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে একটি কবিতা লিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঠালে তা ছাপা হয়না। তবে কবিতাটি 'ধূমকেতু'তে ছাপা হয়েছিল। এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে নজরুল ইংরেজদের বিতাড়িত করার কথাটি হিন্দু ধর্মের প্রচ্ছায় লিখেছিলেন এবং তা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে নজরুলের এই কবিতায় ভারতের লুপ্ত স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনবার আহ্বান ছিল। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা, টীপু সুলতান এবং মীরকাসিম এই কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং তাঁরা স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের প্রেরণার উৎস হয়েছেন। কালী, দুর্গা এবং অন্যান্য দেবতাদের অসুর বধ বা অত্যাচারীদের নিধনের বিষয়টি এই কবিতায় প্রতীকী ভাবনায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। বস্তুত, এই কবিতাটিতে হিন্দু ও মুসলিম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ কবিতাটি যে বাজেয়াপ্ত হবেই নজরুল তা জানতেন। এখানে কবিতাটি তুলে দেওয়া হলঃ

অতঃপর নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। এ সময় নজরুল যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন তা 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পুস্তকে ছাপা হয়েছে। দেশের জন্য নজরুলের আবেগ পুরোমাত্রায় ছিল এবং তিনি নিজের জীবনকেও এজন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ও নজরুলের দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং মনুষ্যত্বের অবমাননা প্রতিহত করার দিকটিও ফুটে উঠেছে। এ সময়ে প্রকাশিত কবিতাবলী নজরুলের কাব্য রচনায় এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে। ইতোপূর্বে এমন চেতনা এবং ভাব-ভাষার এমন উৎকর্ষ সাধন অন্য কারো রচনায় পাওয়া যায় না।

কবিতায় এমন করে স্বাধীনতা, সাম্যবাদ এবং গণমানুষের কথা কেউ বলেননি। এজন্যেই নজরুলকে যুগ-প্রবর্তক হিসেবে গণ্য করা হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাসহ রবীন্দ্রনাথের সমকালে এবং পরবর্তীতে যে সব কবিতা লেখা হয়েছে, নজরুলের কবিতাবলী সে সব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা ও বৈচিত্র এনেছে। তাঁর গানতো অনন্য। এখানে ভাষা ও সুরের যে বৈচিত্র তিনি এনেছিলেন বাংলা গানের ইতিহাসে তাঁর আগে এমনটি কেউ করতে সক্ষম হননি।

জেলে থাকতে রাজন্দীদের প্রতি বিরূপ আচরণের জন্য নজরুল যখন অনশন করেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথই তাঁকে অনশন ভাঙ্গার অনুরোধই জানিয়ে জেলখানায় টেলিগ্রাম পাঠানাঃ

"Give up hunger strike, our literature claims you অনশন ত্যাগ কর। আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায়।" অতঃপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটিকে নজরুলের প্রতি উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় সে সময় যে বসন্ত উৎসব করেছিলেন তাতে এই 'বসন্ত' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।

উপরের আলোচনা থেকে এটা তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নজরুল আসলেইএক বিস্ময়কর প্রতিভা এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁকে তাঁর প্রতিভার জন্য অভিনন্দন জানালেন। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুল যে নতুন ধারা ও চমক নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে তার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। 'বসন্ত নাটক' তাঁর এই স্বীকৃতির নাটক সার্থক প্রকাশ।

সে সময় যাঁরা তাঁর কবিতার শিল্প-সুষমা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, যাঁদের কবিতায় এদেশের মুনষের দুর্বিষহ জীবনের তেমন কোন প্রতিফলন ঘটেনি এবং যাঁরা কেবল কবিতায় পেলব, কুসুম কোমলতাকে কাব্য বিচারের 'মানদণ্ড' মনে করে নির্মমভাবে তাঁর কবিতার অবমূল্যায়ন করেছেন তাঁদের প্রতি তিনি 'আমার কৈফিয়ৎ' নিবেদন করেছেন।

বলেছি, নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্মকে এদেশের গণমানুষের উত্থান, কমিউনিজমের বিকাশ, দেশপ্রেম ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিরাট মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগ করেছিলেন।

কবিতাটির অংশবিশেষ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

আমার কৈফিয়ত

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ঐবিষ্যতের নই 'নবী',
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি!
কেহ বলে, 'তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে!
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরবেলে-বাণী কই কবি?'
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী!
কবি বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা প'ড়ে শ্বাস ফেলে!
বলে, কেজো ক্রমে হ'চ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাশ ঠেলে'।
পড়ে না ক' বই, বয়ে গেছে ওটা।
কেহ বলে, বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা।
কেহ বলে, মাটি হল হয়ে মোটা জেলে বসে শুধু তাস খেলে!
কেহ বলে, তুই জেলে ছিলি ভালো ফের যেন তুই যাস জেলে!

গুরু ক'ন তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা!
প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাঁড়িচাঁচা!'
আমি বলি, 'প্রিয়ে, হাটে ভাঙি হাঁড়ি!'
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি।
সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা ক'ন, 'আড়ি চাচা!'
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি, নাড়ি কাছা!

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল-লা'রা ক'ন হাত নেড়ে,
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে!
ফতোয়া দিলাম– কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও!
'আমপারা'-পড়া হাম-বড়া মোরো এখনো বেড়াই ভাত মেরে!
হিন্দুরা ভাবে, 'পার্শী-শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত-নেড়ে!

বন্ধু! তোমরা দিলে না ক' দাম,
রাজ-সরকার রেখেছেন মান!
যাহা কিছু লিভি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন! আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার, প্রহরী সদাই কার পিছু?

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটু নুন,
বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে না ক' তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

বন্ধুগো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পানি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না ক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!
পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ বেটে গেলে,
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো– যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!

মুজফ্‌ফর আহমদের গ্রন্থ পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে নজরুল সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদৈশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯২৪ সালে হুগলীতে থাকাকালীন সময়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তার মুখোমুখি পরিচয় হয়েছিল। গান্ধীজী তাঁর কবিতা ও গান শুনে খুবই খুশী হয়েছিলেন। গান্ধীজী সে সময় নজরুলকে বলেছিলেন যে তিনি নজরুলকে স্বপ্নে দেখেছেন। গান্ধীজীর আগমনে নজরুল চরখা'র কবিতা লিখলেও তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে চরখা ও খদ্দরের মাধ্যমে দেশে স্বাধীনতা কোনদিন আসবে না। অতঃপর নজরুল নিজেই রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দলের নাম হয় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের লেবার স্বরাজ পার্টি (The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress.) এই পার্টি গঠনের পর এর প্রথম ইশতিহার নজরুল লিখেছিলেন। এ সময়ে পার্টির মুখপাত্ররূপে 'লাঙ্গল' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'লাঙ্গল' এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কলকাতার ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোড থেকেই 'লাঙ্গল' কাগজের প্রকাশ শুরু হয়। এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন নজরুল ইসলাম। সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হতো মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের। কিন্তু এর সব লেখা, সম্পাদকীয় সবই নজরুলকেই লিখতে হতো। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর, মানুষ পাপ, বারাঙ্গনা, নারী, কুলি-মজুর প্রভৃতি কবিতা ছিল এই সাম্যবাদী

কাব্যের অংশ। মুজফ্‌ফর আহমদের মতে 'সাম্যবাদী' রুশভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারী 'লাঙ্গল' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'কৃষকের গান'। ৭ জানুয়ারী ১৯২৬ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতা।

এই সময় 'লাঙ্গল' পত্রিকা ছিল শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের মুখপাত্র। নজরুল হুগলী থেকে কৃষ্ণনগরে এসে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের অধিবেশন গড়ে তোলেন। নজরুল পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগও নিয়েছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে মিলে। রাজনীতির পাশাপাশি কাব্যচর্চা ও লেখালেখি সফলভাবে চলেছিল।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতয় হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা বাঁধে। সে সময়ে মুসলমানেরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় নজরুলের বিখ্যাত সঙ্গীত 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' প্রকাশিত হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নজরুলের এই গান শুনে মুগ্ধ হন। তিনি এই সঙ্গীতকে 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন।

নজরুলের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া। মুজফ্‌ফর আহমদের প্রচেষ্টায় নজরুল নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেননি। কিন্তু প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষিত হয়েছিল এবং নির্বাচনে তিনি হেরে গিয়েছিলেন।

১৯২৯ সালে ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ কিংবা মার্চের প্রথম সপ্তাহে মুজাফ্‌ফর আহমদ এবং নজরুল কুষ্টিয়ায় একটি কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। সে সময় নজরুলের বন্ধু হেমন্তকুমার সরকার সস্ত্রীক কুষ্টিয়ায় থাকতেন এবং কুষ্টিয়াতে কৃষক সম্মেলনের উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি। তাঁর নিমন্ত্রণে পুত্র বুলবুল ও দু'মাসের শিশু সব্যসাচী (সানি) কে নজরুল সস্ত্রীক ও শ্বাশুড়ীকে নিয়ে হেমন্ত সরকারের কুষ্টিয়ার বাসায় অবস্থান করেন। কুষ্টিয়াতে নজরুল কৃষক সম্মেলনের সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এক সময় নজরুল চুয়াডাঙ্গা মহাকুমা বর্তমানে জেলা অন্তর্গত কার্পাসডাঙ্গায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এখানে তাঁর বিখ্যাত গল্প পদ্ম-গোখরো লেখা হয়েছিল।

নজরুলের প্রেম, বিবাহ

মুজফ্‌ফর আহমদের নজরুল সম্পর্কীয় গ্রন্থ অতুলনীয় এ কারণে যে নজরুল সম্পর্কে অনেক না জানা তথ্য তিনি এখানে দিয়েছেন। এই গ্রন্থে তিনি নজরুলের প্রেম, বিরহ এবং বিবাহ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। নজরুল কোন কোন মেয়ের প্রেমে পড়েও শেষে হিন্দু মেয়ে প্রমীলাকেই তিনি জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। প্রমীলা দেবীর মা গিরিবালা দেবী নজরুলের অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে যা করেছিলেন তাতে তিনি নজরুলের যথার্থ মা-ই হয়েছিলেন। মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন, অসুস্থ হয়ে নজরুল কাপড়-চোপড় নষ্ট করে ফেলতেন। গিরিবালা দেবী একটুকও ঘৃণা না করে সে সব কাপড় চোপড় পরিষ্কার করতেন এবং নজরুলের যত্ন নিতেন। নজরুলের বাড়ীতে হিন্দুয়ানী প্রভাব তেমন ছিলনা। প্রমীলা দেবী মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে

চুরুলিয়াতে নজরুলের গ্রামে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। এতে বোঝা যায় প্রমীলা মুসলিম ঐতিহ্য অস্বীকার করেননি। প্রমীলা চেয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যু হলে নজরুলের পাশে যেন তাঁর কবর হয়। কিন্তু সেটা আর হয়নি। নজরুলের আগেই ১৯৬২ সালে প্রমীলার মৃত্যু হলে নজরুলের ভাইপোরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাঁকে চুরুলিয়াতে নিয়ে গিয়ে পারিবারিক গোরস্থানে কবর দেয়।

প্রমীলা আদর্শ স্ত্রী ছিলেন। নজরুলের কাব্যচর্চা ও রাজনীতি কর্মকাণ্ডে তিনি কখনও বাধা হননি। মা গিরিবালা দেবী চলে গেলে প্রমীলা বড় একা হয়ে পড়েন। তিনি নজরুলের মতো উচ্ছল ছিলেন না। বয়সের তুলনায় নজরুল থেকে বেশ ছোট হলেও অত্যন্ত ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। যতদিন বেঁচেছিলেন অসুস্থ অবস্থায়ও নজরুলকে তিনি সেবা করেছেন।

আমি 'নজরুল' সম্পর্কে যত বই পড়েছি তাঁর মধ্যে মুজফ্‌ফর আহমদের গ্রন্থটি নজরুল জীবন ও কর্ম বিষয়ে সত্যকথন, একান্ত আন্তরিক এবং নির্ভেজাল বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। মুজফ্‌ফর আহমদ নজরুল অপেক্ষা দশ বৎসরের বড় ছিলেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে বেশী ছিল এবং তিনি অত্যন্ত বাস্তববাদী ও পরোপকারী ছিলেন। নজরুলের বিপদ-আপদে তিনিই ছিলেন তাঁর যথার্থ বন্ধু। প্রমীলা দেবী তা বুঝেছিলেন বলে তিনি তাঁকে বড় ভাই হিসেবে 'কদমবুচি' (প্রণাম) করে ছোট বোন হয়েছিলেন। বাস্তবিক তাঁর গ্রন্থ পাঠ করে নজরুলকে যত বেশী জানা যায় অন্যদের লেখা পাঠ করে তা জানা যায় না। এমনকি তাঁর অনেক ঘনিষ্ট বন্ধু যেমন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ লেখকদের রচনায় তা মেলে না। মুজফ্‌ফর আহমদে লেখা পড়েই বেশ বোঝা যায় সে নজরুলের কর্মজীবনে যাঁরা জড়িয়েছিলেন তাঁরা অনেক সময় অবিশ্বাসের কাজ করেছেন এমন কি তাতে নজরুলের জীবন ও মর্যাদা বিপন্ন হয়েছে। অবশ্য তাঁদের অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন। মুজফ্‌ফর আহমদ অবশ্য তাঁদের অনেকের বিশ্বাসঘাতকতাকে তাঁর লেখার মাধ্যমে ফাঁস করে দিয়েছেন।

মুজফ্‌ফর আহমদের 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে নজরুলের প্রেম ও বিবাহের বিষয়ে নানা বর্ণনা রয়েছে। এসব বিবরণ অনেকের কাছেই অজানা।

নজরুল আমৃত্যু আবেগ প্রবণ ছিলেন। এই আবেগই ছিল তাঁর শক্তি। অসম্ভব ধরণের প্রাণবন্ত এবং অবিশ্বাস্য রকমের আবেগতাড়িত হওয়ায় জীবনে বিশ্রাম কি জিনিষ নজরুল তা কখনও উপলব্ধি করেননি। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রেম। বিয়ের আগে তিনি বহু নারীর প্রেমে পড়েছিলেন এবং এই প্রেমে পড়ার কারণেই বোধকরি নজরুল এত চমৎকার কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস এমন কি সাহসী নিবন্ধ লিখতে পেরেছিলেন।

বলেছি, নজরুল আবেগপ্রবণ হওয়ায় হঠাৎ কোন দিকে তাঁর মন ধাবিত হবে সে সম্পর্কে তিনি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করতেন না। তাঁর নিজের জীবনে তা বহুবার

ঘটেছে। কিন্তু তাঁর জীবনে 'হঠাৎ প্রেম' ও তা থেকে পরিণয়ে পৌঁছে যাওয়াটা ছিল এমনি এক অবিবেচনাপ্রসূত কর্ম। তবে এটাও সত্যি যে তাঁর প্রথম যৌবনে কোন তরুণীর কাঁচা বয়সের আত্মনিবেদন তাঁর কবি মনে দোলা দিয়ে যেতেই পারে। এবং তিনি তাতে মতও দিয়েছিলেন। তিনি তখনও ভাবেন নি মেয়েটি তাঁর জীবনের জন্য উপযুক্ত কিনা। এমন কি নজরুলের মত একজন কবির স্ত্রী হবার জন্য সামান্যতম লেখা পড়াও তার ছিল না। নজরুল সে সম্বন্ধ ভাবেননি। আলী আকবর খান তাঁর বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে কোন প্রতারণা করছেন এমনটিও তাঁর মনে আসেনি। সুতরাং বিবাহে নজরুল মনস্থির করে ফেললেন এবং সে খবর তাঁর সব বন্ধুদের জানিয়েও দিলেন। এসব ক্ষেত্রে আবেগ প্রবণ মানুষের যা হয়–নজরুলের ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল। আলী আকবর খানের প্রতারণা নজরুল বুঝে ফেললেন এবং এ বিয়ে প্রত্যাখান করে বিয়ের পীড়া থেকেই উঠে পড়েন।

এখানে নজরুলের এই প্রেম বিষয়ে বলতে হয় যে কলকাতা থেকে কুমিল্লায় এসে আলী আকবর খানের বাড়ীতে আনন্দ-হিল্লোলে নজরুল যখন গান গেয়ে বাঁশী বাজিয়ে সকলকে মাৎ করেছিলেন সে সময় হঠাৎ একটি যুবতী মেয়ে তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিল, 'গতরাত্রে আপনি কি বাঁশী বাজিয়েছিলেন? আমি শুনেছি।' এতে নজরুলের মনে দোলাতো লাগবেই। কিন্তু প্রতারণার শিকার হয়ে তিনি যখন ফিরে এলেন বিয়ে না করেই, সেই মুহূর্তে এই যুবতী মেয়ে যাঁর আসল নাম ছিল সৈয়দা খাতুন, তিনি ছিলেন আলী আকবর খানের ভাগ্নি এবং নজরুল তার নতুন নাম দিয়েছিলেন 'নার্গিস'। তাঁর জন্য কি তাঁর মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। সেই মুহূর্তে তাঁকেও নজরুল অবিশ্বাস করেছিলেন এবং সব কিছুই তাঁর কাছে অভিনয় বলে মনে হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে গান লেখায় তা স্পষ্ট হয়ে যায়। নার্গিস একটি চিঠিতে নজরুলকে লিখেছিলেন যে নজরুল তাঁর কাছে কাউকে (দুত) পাঠিয়েছিলেন কোন এক সময়ে। কিন্তু ঘটনাটি আদৌ সত্য ছিল না। নজরুল নার্গিসের পত্রের উত্তরে যা লিখেছিলেন তার অংশ বিশেষ এখানে দেওয়া হলঃ

"আমি কখনো কোনো 'দুত' প্রেরণ করি নি তোমার কাছে। আমাদের মাঝে যে অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, তার 'সেতু' কোন লোক তো নয়ই––স্বয়ং বিধাতাও হতে পারেন কিনা সন্দেহ।...

তোমার ওপর আমার কোন অশ্রদ্ধাও নেই। কোন অধিকারও নেই আবার বলছি।...

তুমি রূপবতী, বিত্তশালিনী, গুণবতী, কাজেই তোমার উমেদার অনেক জুটবে–তুমি যদি স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমি কোন অধিকারে তোমায় বারণ করব– বা আদেশ দিব? নিষ্ঠুর নিয়তি সমস্ত অধিকার থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছে।"

তারপরে নজরুল ওই পত্রে আরো লেখেনঃ

"আমি জানি তোমার সেই কিশোরীমূর্তিকে, যাকে দেবী-মূর্তির মত আমার হৃদয়-বেদীতে অনন্ত প্রেম অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম, সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণবেদীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদী-পীঠ।"

মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন যে ১৯৬৪ সালের ৩০ অক্টোবর তিনি নজরুলের বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ী গিয়েছিলেন। সে সময় শৈলজানন্দ তাঁকে জানান যে একদিন তিনি যখন ১০৬ আপার চিৎপুর রোডে গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল রুমে নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন নজরুল তাঁকে নার্গিস বেগমের নিকট থেকে পাওয়া পত্রখানা পড়তে দেন। শৈলজানন্দ তাঁকে উত্তর দিতে বললে অল্পক্ষণের মধ্যে নজরুল একটি গান লিখে তাঁর হাতে দিয়েছিলেন এবং এটাই তাঁর পত্রোত্তর। যা হোক। এ গানটি নার্গিস বেগমের কাছে পৌঁছেছিল কিনা তা জানা যায়নি। তবে এই গানে নজরুলের চরিত্রের একটি দিক বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখ তারে।
ভুলে যাও তারে ভুলে যাও একেবারে ॥
আমি গান গাহি আপনার দুখে
তুমি কেন আসি দাঁড়াও সুমুখে,
আলেয়ার মত ডাকিও না আর নিশীথ অন্ধকারে ॥
দয়া কর দয়া কর, আর আমারে লইয়া
খেলোনা নিঠুর খেলা।
শত কাঁদিলেও ফিরিবে না সেই শুভ লগনের বেলা ॥
আমি ফিরি পথে তাহে কার ক্ষতি
তব চোখে কেন সজল মিনতি
আমি কি ভুলেও কোনো দিন এসে দাঁড়িয়েছি তব দ্বারে?
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে।

মুজফ্‌ফর আহমদ এ প্রসঙ্গে লেখেনঃ

"এখানেই নজরুল আসল কথা বলেছে। সে কবি মানুষ। কবিত্বময় ভাষায় কথাটা বলেছে। আমরা, যারা কবি নই, আমাদের নিকটে ব্যাপারটা যেভাবে ফুটে উঠেছে তা আমি আগেই বলেছি। অর্থাৎ নজরুল ইসলাম নার্গিসকে একান্তভাবে ভালবেসেছিল। কোনোখাদ ছিলনা সেই ভালবাসায়। আর, নার্গিস প্রথমে ভালবাসার অভিনয় করেছিলেন। পরে সেই অভিনয়ের পর্দা তুলে দিয়ে নিজের যে মূর্তি তিনি দেখিয়েছিলেন আশাহত নজরুল তার সামনে আর তিষ্টোতে পারেননি। ১৯২১ সালের ৬ জুলাই তারিখের রাত্রে এই কথাই নজরুল আমায় বলেছিল।

পনের বছর পরে যে পত্র নার্গিসকে সে লিখেছিল তারও মানে এই-ই দাঁড়ায়। অবস্থার বিপাকে পড়ে আলী আকবর খানেরা নজরুলকে বিদায় করতে বাধ্য হয়েছিল, যদিও তাঁদের প্রথম পরিকল্পনানুসারে এটা তাদের একেবারেই কাম্য ছিলনা। তাদের এই পরিকল্পনার সময় নজরুলকে তাঁরা একটি অসহায় প্রাণী ভেবেছিলেন। কিন্তু সেদিন নজরুল যদি চলে না যেত তবে তার পৌরুষ প্রচণ্ড ঘা খেত।" (পৃ. ৭৪-৭৫)

অন্যান্য গ্রন্থে নজরুলের এই বিবাহ সংক্রান্ত যে সব তথ্যাদি প্রকাশ পেয়েছে, মুজাফ্ফর আহমদের এই গ্রন্থ পাঠ করলে তার একটি সঠিক বিবরণ পাওয়া যাবে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে আলী আকবর খানের ভাগ্নি সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিসের সাথে নজরুলের বিয়ে না হলেও নজরুল কুমিল্লার শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারে সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে পড়েন। আলী আকবর খান শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের ছোট ভাই বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ওরফে বীরেন সেন তাঁর সহপাঠী ছিলেন। নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কুমিল্লার মুরাদনগর থানার দৌলতপুর গ্রামে আসবার পথে শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের কুমিল্লার বাসায় অতিথি হন। এসময় নজরুলের কবিনাম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। নজরুল ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী বিরাজ সুন্দরীর বাড়ীতে অভ্যর্থিত হন।

এখানেই নজরুল বিরজাসুন্দরী দেবীকে 'মা' হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই বাড়ীতেই গিরিবালা দেবী ও প্রমীলার সাথে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ আনন্দ-হুল্লোড় ইত্যাদি হয়েছিল। অতঃপর এই পরিবারের সঙ্গেই নজরুল আপনজন হয়ে উঠলেন। কুমিল্লায় নার্গিসের সঙ্গে বিবাহের দিন ধার্য হলে নজরুল বিরজাসুন্দরী দেবীসহ সকলকে আলী আকবর খানের বাড়ীতে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের যাবার পর সেখানে নজরুলের সঙ্গে নার্গিসের বিয়ে হয় না। নজরুল রাগ করে বিয়ের আসর থেকে উঠে কুমিল্লায় ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় চলে আসেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। এটা ছিল ১৯২১ সালের ঘটনা। অতঃপর মুজফ্ফর আহমেদ ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসা থেকে নজরুলকে কলকাতায় নিয়ে আসেন।

আমার যতদূর ধারণা নজরুল ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর এই বাড়ীতেই তাঁর আপন বাড়ী হিসেবে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সে কারণে ১৯২২ সালে আবার তিনি কুমিল্লায় ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর বাসায় একাধারে ৩/৪ মাস ছিলেন। এই বাড়ীতে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বড় ভাই ত্রিপুরা রাজ্যের নায়েব বসন্তকুমার সেনগুপ্তের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গিরিবালা দেবী তাঁর কন্যা প্রমীলাকে নিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর এসে উঠেন। এখানেই প্রমীলাকে দেখে নজরুল মুগ্ধ হন এবং তাঁকে বিয়ে করতে মনস্থির করেন। এই বিয়েতে ইন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তাঁর স্ত্রী বিরাজসুন্দরী দেবী, বীরেন কুমার সেনগুপ্ত কেউই রাজী হননি। কিন্তু গিরিবালা দেবী ও প্রমীলা এই বিয়েতে রাজী হন। নজরুল ও প্রমীলার বিয়ে ইসলামী মতে হয়নি। মুঘল বাদশাহেরা যেভাবে হিন্দুনারী বিবাহ করতেন সেই

ভাবেই বিয়ে হয়। অর্থাৎ বিয়ের পর যাঁর যাঁর ধর্ম তাঁরা অনুসরণ করতেন। ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল এই বিয়ে হয় কলকাতার ৬ নম্বর হাজী লেনের বাড়ীতে। অবশ্য প্রথমদিকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবার এই বিয়ে মেনে না নিলেও পরে সবাই এই বিয়েকে মেনে নেন এবং যথারীতি তাঁদের মধ্যে যাতায়াত হতে থাকে। নজরুল এই বিয়েতে শান্তি খুঁজে পান। কিন্তু এতদসত্বেও তাঁর জীবন থেকে কখনও দারিদ্র দূরীভূত হয়নি। সব সময় তিনি টাকার জন্য কষ্ট পেয়েছেন।

এখানে বলা প্রয়োজন বৃটিশ ভারতে নজরুলের সমকালে বহুবার দাঙ্গা হয়েছে। বহু হিন্দু-মুসলমান এই দাঙ্গায় নিহত হয়েছে। নজরুল এসব দেখে খুব কষ্ট পেতেন। তিনি নিজে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এবং একজন হিন্দু নারীকে বিয়ে করে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। ইসলাম ধর্ম নিয়ে কবিতা-গান লিখলেন। হিন্দুদের জন্য শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে তাদের অনেকের প্রিয় হলেও মুসলমান ও হিন্দু সমাজ তাঁকে কখনও পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। নজরুল 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' লিখে সকলকে এককাতারে আসতে আহ্বান জানালেন। কিন্তু কোন কিছুতেই কিছু হল না। নজরুল এক সময় অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু দ্বিজাতী তত্ত্ব তখনকার হিন্দু ও মুসলমানদের বাঁচার মন্ত্র মনে করে উভয় সম্প্রদায় দেশবিভাগ মেনে নিলেন। সান্ত্বনার বিষয় নজরুলকে তা দেখতে হলনা। তিনি রুদ্ধবাক হয়ে পড়লেন। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও দেশবিভাগ দেখতে পাননি।

মুজফ্ফর আহমদের গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ আর এক কারণে যে নজরুল অনেক হিন্দু কবি সাহিত্যিককে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন। এসময় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্টতা বাড়ে। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'খাঁচার পাখি' নামে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশ পায়। এই কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অসুস্থ থাকার বিষয়টি কবিতায় এনেছিলেন। নজরুল এ কবিতাটি পাঠ করে খুব কষ্ট পান। অতঃপর 'মোসলেম ভারতে' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে নজরুল 'দিল-দরদী' নামে কবিতা লেখেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাটি পাঠ করে খুশী হয়েছিলেন কিন্তু 'দিল দরদী' প্রকাশের এক বছরের মধ্যে তিনি ১৯২২ সালের ২৪শে জুন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর নজরুল 'সেবক' পত্রিকায় একটি ভাবপ্রবণ সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। অতঃপর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে একটি শোকসভা হয় এবং সেখানে নজরুল তাঁকে নিয়ে একটি গান লেখেন এবং নিজে সেই শোকসভায় তা পরিবেশন করেন।

বলেছি, কমরেড মুজফ্ফর আহমদের স্মৃতিকথা এক অমর রচনা। কী গভীর ভালবাসা এবং প্রীতিময়তা উভয়ের মধ্যে ছিল তা এই গ্রন্থ পাঠ না করা গেলে তা বোঝা যাবেনা। কমরেড মুজফ্ফর আহমদের একটি আশা বড় ছিল যে নজরুল সকলের নিকট সমাদৃত হবেন এবং তাঁকে নিয়ে অনেক বড় বড় বই লেখা ও গবেষণা হবে। তাঁর সে আশা অনেকাংশে পূরণ হয়েছে। অনেক পণ্ডিত ও গুণীজন নজরুলকে নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।